কর্মক্ষেত্র, সম্পত্তি ও শিক্ষায়

নারীর অধিকার

(ইসলামি দৃষ্টিকোণ)

অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল

কর্মক্ষেত্র, সম্পত্তি ও শিক্ষায় নারীর অধিকার: ইসলামি দৃষ্টিকোণ

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা ‘আলোকধারা বুক্স’-এর পক্ষে

প্রকাশক:
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক- ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

প্রথম প্রকাশ:
আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,
অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

লেখক:
অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল

গ্রন্থস্বত্ব:
আলোকধারা বুক্‌স

মুদ্রণে:
‘আলোকধারা বুক্‌স’
‘ডিউ উদয়ন’ (লেভেল-১২)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মূল্য: ২৫০ টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-8083-41-3

উৎসর্গ

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মক্ষেত্র, সম্পত্তি অর্জন ও শিক্ষায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইসলামের আবির্ভাব সময়ের সর্বস্ব ত্যাগী
উম্মুল মু'মিনীন হযরত মা খাদিজাতুল কুবরা (রাদ্বি.)

এবং

এর ধারাবাহিকতায় এ শতকের নারীগণের আধ্যাত্মিক জাগরণের পথিকৃৎ
উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম (রাদ্বি.)-এর করকমলে।

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

মহিমান্বিত ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে ঘোষিত মানব জীবন বিধানে অন্য সব কিছুর মতো পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থার খোদায়ী নীতিও স্পষ্ট করা হয়েছে। কোরআন ঘোষণা করেছে "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্প হোক বা বেশি– এ অংশ আল্লাহ্ নির্ধারিত" –(সূরা নিসা : ৭)। সূরা নিসার ৮, ৯, ১০, ১১ এবং ১২ নং আয়াতে পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তি বণ্টনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান' –(সূরা নিসা : আয়াতাংশ-১৩)।

আমাদের সংরক্ষণশীল সমাজে এমনকি এক শ্রেণির শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে নারীদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে নারীদের বঞ্চিত করার সংকীর্ণ মানসিকতা পুরুষ সদস্যদের অনেকের মধ্যে প্রায়শ লালিত বিষয়। অথচ কোরআনে এ ধরনের প্রবণতা পরিপূর্ণভাবে বারিত। কোরআনে নর-নারী উভয়ের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার বিধান আছে। সম্পদ-সম্পত্তি এবং অর্থ উপার্জনের বিষয়ে বলা হয়েছে, 'যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করবে সেটা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং যা কিছু নারীরা উপার্জন করবে সেটা তাদের অংশ।' কর্মক্ষেত্রে সম্ভ্রম-শালীনতা বজায় রেখে নারীদের কাজ করার স্বাধীন অধিকার দিয়েছে আল্ কোরআন। এমনকি যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়ও ইসলামের প্রাথমিক সময়ে স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণের সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। হাদিস শরিফ অনুযায়ী দেখা যায়, এক সাহাবি হুজুর (দ.) সমীপে তাঁর এক ছেলে এবং কন্যার লেখা-পড়া বিষয়ে নির্দেশনা প্রার্থনা করেন। দুজনকে লেখাপড়া করানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি উক্ত সাহাবার ছিল না। তিনি হুজুর (দ.) সমীপে পুত্রের

লেখা-পড়া শিখার বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেন। হুজুর (দ.) কন্যাকে লেখা পড়া শেখানোর নির্দেশ দেন। উক্ত সাহাবি হুজুর (দ.)-কে পুত্রের লেখা পড়া করালে আয়-উপার্জন বাড়ার সম্ভাবনা আছে বলে জ্ঞাত করেন। তখন হুজুর (দ.) পুনরায় কন্যাকে লেখা পড়া শেখানোর জন্য নির্দেশ দেন। তৃতীয় বারও একই প্রশ্ন করা হলে হুজুর (দ.) শেষ বারের মতো উক্ত সাহাবিকে জানান যে, কন্যাকে লেখা পড়া শেখাও। এর ফলে পরিবারের সকলে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সবাই শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

বিশ্বনবি (দ.)'র এ ধরনের নির্দেশনা নারীদের শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি প্রাথমিক এবং প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম শালীনতা রক্ষা করে নারীদের সকল প্রকার বৈধ উপার্জন, কর্মকাণ্ড এবং অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পবিত্র কোরআন, হাদিস শরিফ, রাসুলে করিম (দ.)'র জীবন, সাহাবায়ে কেরাম এবং নারী সাহাবিদের কর্মধারায় তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে। জনাব আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইকবাল রচিত *কর্মক্ষেত্র, সম্পত্তি ও শিক্ষায় নারীর অধিকার: ইসলামি দৃষ্টিকোণ* পুস্তকে তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশা করি– এ পুস্তক উৎসুক পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের কল্যাণ সদয়ভাবে অবধারিত করুন।

– এম জেড এইচ এম ট্রাস্টি

সূচিপত্র

অবতরণিকা – ৯

নারীর কর্মক্ষেত্র ও ইসলাম – ১৫

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও ইসলাম – ৩৯

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে নারীর অধিকার – ৬৩

উপসংহার – ৭৭

অবতরণিকা

মহান আল্লাহ্ হযরত আদমকে (আ.) এবং পরপর তাঁর সঙ্গিনী হযরত হাওয়াকে (আ.) সৃষ্টি করেছেন। আর পৃথিবীতে দু'জনকে একসঙ্গে প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম-হাওয়া দু'জনেই পৃথিবীতে প্রথম মানব-মানবী, যাঁরা আগমন করেছেন একই পরিবেশে, অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। তাঁদের মাধ্যমে বিস্তৃতি ঘটেছে মানব সমাজের। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে, "হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন"।[১] মহান আল্লাহ্ তায়ালার এই বাণী হতে এটাই স্পষ্ট যে, মানবমণ্ডলী তথা নর-নারী সৃষ্টিগতভাবে একই সত্তার দু'টি রূপ, নাম ও ধরন। উভয় সত্তাকে ঔরসজাত ও মানবিক সম্পর্কে এই দু'টি দৃঢ়-মজবুত ভিত্তির উপর মিলিত রাখা হয়েছে। তাই পুরুষ ও নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজন।

পবিত্র কোরআনে আরও ঘোষণা করা হয়েছে– "হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন"।[২] এভাবে পবিত্র কোরআন আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করে যে, সৃষ্টিগতভাবে ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নর-নারী সমান।

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ১।
২. আল্ কোরআন, সূরা হুজুরাত : ১৩।

আবার পবিত্র কোরআনে নারী-পুরুষ উভয়ের শাস্তির ব্যাপারেও সমান বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও– তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে"।[১] "ব্যভিচারিণী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর"।[২]

নর-নারী উভয়ের মধ্যে সামাজিক আচার-ব্যবহারের সমতার ক্ষেত্রে আল কোরআনে উল্লেখ আছে, "সকল মুমিন পরস্পর ভাই ভাই। অতএব (কোন বিবাদ হলে) তোমরা ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে নাও। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। অবশ্যই তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে"।[৩] "আর তোমরা লোকদের মধ্যে ফয়সালা করার সময় 'আদল' বা ন্যায়নীতি সহকারে ফয়সালা কর। আল্লাহ্ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন এবং দেখেন"।[৪]

এমনিভাবে ইসলাম শরিয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রেও নর-নারী উভয়ের সমতা বিধান করেছে। যেমন কোরআনের বাণী, "নিশ্চয় সালাত (নামায) নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করার জন্য মু'মিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে"।[৫] "হে মু'মিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে...."।[৬] এখানে মুমিনগণ বলে মুমিন নর-নারী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সমভাবে।

---

১. আল্ কোরআন, সূরা মায়েদা : ৩৮।
২. আল্ কোরআন, সূরা নূর : ২।
৩. আল্ কোরআন, সূরা হুজুরাত : ১০।
৪. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৫৮।
৫. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ১০৩।
৬. আল্ কোরআন, সূরা বাক্বারা : ১৮৩।

আখেরাতেও নর-নারী উভয়ে তাদের কৃতকর্মের ফল যার যার আমল অনুযায়ীই পাবে। সেখানেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হবে না। পবিত্র কোরআনে এসেছে, "পুরুষ ও নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মু'মিন হয় তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট করা হবে না"।[১] "অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের কর্মনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীর কর্ম বিফল করি না"।[২] "একথা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম (রোযা) পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী, তাদের সকলের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন"।[৩]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নর-নারীর সমান অধিকারের কথা বর্ণনা করে পবিত্র কোরআনে এসেছে, "যা কিছু পুরুষেরা অর্জন করেছে সেটা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং যা কিছু নারীরা অর্জন করেছে সেটা তাদের অংশ। আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ফযল ও মেহেরবানীর জন্য দোয়া করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞাত"।[৪] "আর যখন নামায শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান কর। আর অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর"।[৫]

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ১২৪।
২. আল্ কোরআন, সূরা আলে ইমরান : ১৯৫।
৩. আল্ কোরআন, সূরা আহযাব : ৩৫।
৪. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৩২।
৫. আল্ কোরআন. সূরা জুমুআ : ১০।

সামাজিক বন্ধন ও বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম স্ত্রীলোকের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তাদের দেন-মোহর খুশি মনে দিয়ে দাও। আর যদি তারা খুশি হয়ে তা হতে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারো"।[১] হাদিস শরিফেও এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রাদ্বি.) বলেন, এক কুমারী মেয়ে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে অভিযোগ করল যে, তার পিতা তাকে এমন লোকের সাথে বিয়ে দিতে চায় যাকে সে পছন্দ করে না। মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার দিলেন।[২] নারীর মর্যাদা ইসলাম ধর্মে এতো সুউচ্চ যে, মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন, "জান্নাত তার (তোমার মায়ের) পদতলে"।[৩]

কাজ বা পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীদের পুরুষের মতোই অধিকার নিশ্চিত করেছে। আর বর্তমান সময়ে পরিবারে সচ্ছলতা নিশ্চিত করতে মহিলাদের পেশা বা চাকুরী গ্রহণ করতে হচ্ছে। পবিত্র হাদিসে এসেছে– হযরত জাবের হতে বর্ণিত... নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মে মুবাশ্শিরা আনসারীর (রাদ্বি.) খেজুর বাগানে প্রবেশ করে তাকে বললেন, কে এই বাগান তৈরি করেছে? মুসলিম নাকি অমুসলিম? উম্মে মুবাশ্শিরা বললেন মুসলিম তৈরি করেছে। তিনি বললেন, "কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে, কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর কোন মানুষ, পশু বা অন্য কিছু তার ফল খায়,

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৪।

২. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : বিবাহ, অনুচ্ছেদ : ২৫– যদি পিতা তার কুমারী কন্যাকে তার অমতে বিয়ে দেন, হাদিস নং : ২০৯৬, ২০৯৭।

৩. সুনানে নাসাঈ, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : যার মাতা জীবিত তার জন্য জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি, হাদিস নং- ৩১০৪; শুয়াবুল ঈমান; মুসতাদরাক আল্ হাকিম।

তাহলে তাও তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে”।[১] একজন মহিলা সাহাবি পশু চরানোর কাজ করতো। হযরত সা’দ ইবনে মুয়ায থেকে বর্ণিত, কা’ব ইবন মালিকের একটি মেয়ে সালা পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাচ্ছিল। একটি বকরী আঘাতপ্রাপ্ত হলে সে সেটিকে পাথর দ্বারা জবাই করে দেয়। পরে নবি করিমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, (এর গোশত) খাও”।[২]

আল্লাহ্‌র নবির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে মহিলারা কুটির শিল্পের কাজ করতো, নার্সিং ও চিকিৎসার কাজ করতো বলে সহিহ্ বুখারির হাদিসে উল্লেখ আছে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলারা পশু চারণা, কুটির শিল্পের কাজ ও নার্সিংসহ অনেক কাজে পর্দাসহকারে পুরুষদের মতই অংশ নিত।

নারীদের রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রেও সমান অধিকার। যেমন পবিত্র কোরআনের বাণী– “পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রভু মহান, যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না”।[৩] মহান আল্লাহ্‌র এই আদেশে সকল বান্দা তথা নর-নারী উভয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয সাব্যস্ত হয়। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, “প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয”।[৪] এছাড়াও রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলা সাহাবিদের নির্দিষ্ট দিনে হাদিস শ্রবণ করতে নির্দেশ দেন।[৫]

---

১. সহিহ্ মুসলিম, অধ্যায় : মুসাকাহ, পরিচ্ছেদ : ফলজ বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযিলত, হাদিস নং : ৩৮৬০-৩৮৬৪।

২. সহিহ্ বোখারি, অধ্যায় : যবেহ ও শিকার করা, পরিচ্ছেদ : দাসী ও মহিলার যবেহকৃত জন্তু, হাদিস নং : ৫৫০৫।

৩. আল্ কোরআন, সূরা আলাক্ব : ১-৫।

৪. সুনানে ইবন মাজাহ, অধ্যায় : ভূমিকা, পরিচ্ছেদ : আলিমদের মর্যাদা এবং জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা, হাদিস নং : ২২৪।

৫. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : ইল্‌ম, পরিচ্ছেদ : নারীদের জ্ঞান লাভের জন্য আলাদাভাবে দিন নির্ধারন করা যায় কি?, হাদিস নং : ১০১; সহিহ্ মুসলিম; মুসনাদে আহমদ।

উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভেও নারীদের অধিকার ইসলাম সুনিশ্চিত করেছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। অল্প হোক কিংবা বেশি হোক। এ অংশ নির্ধারিত"।[১]

মাতা-পিতার মধ্যেও সমতার বিধান ইসলাম করেছে। এক্ষেত্রে মাতার সম্মান আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের একজন, কিংবা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছালে (তাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে) উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদের ধমকাবে না। তাদের সাথে সদা ভদ্র ব্যবহার করবে, তাদের কাছে দয়ার বিনম্র বাহু অবনত কর এবং বল, হে রব, তাদের দয়া কর যেমনিভাবে তারা আমাকে দয়া করে ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছেন"।[২]

মূলত নর-নারী উভয়কে ইসলাম মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচারিকসহ সর্বক্ষেত্রে সমভাবে মূল্যায়ন করেছে। তবে ইসলামি শরিয়তে কিছু ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে পার্থক্য দৃষ্ট হলেও তাও মূলত শালীনতা, সম্ভ্রম, পারস্পরিক শারীরিক আবরণের সৌন্দর্য সমতার জন্যই। এটা সূক্ষ্মভাবে দেখলে বুঝা যায়, ন্যায্য অধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই পার্থক্য। তবে বিচার-সাম্যের দৃষ্টিতে এটি নর-নারীর যথার্থ মর্যাদার দিক নির্ধারণ করে দিয়েছে।

বর্তমান সময়ে নারীরা যে সব ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় বাধার সম্মুখিন হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– কর্মক্ষেত্র, সম্পদ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে। মূলত এই তিনটি বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এই পুস্তিকায় তথ্যবহুল আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এই ছোট্ট খিদমতকে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করুন এবং আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৭।

২. আল্ কোরআন, সূরা বনি ইসরাঈল : ২৩-২৪।

নারীর কর্মক্ষেত্র ও ইসলাম

নিজ হাতে উপার্জনের ব্যাপারে উম্মতকে তথা নর-নারী সবাইকে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ্‌র নবি হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেন, "কোন ব্যক্তি তার নিজ হাতে (অর্থাৎ নিজ মেধা ও শক্তিতে) উপার্জিত সম্পদের চাইতে উত্তম কোন কিছু খাদ্য হিসেবে কখনো আহার করে না"।[১] অন্য এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "ব্যক্তি উপার্জনের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্যই পবিত্রতম খাদ্য যা সে খায়। আর তার সন্তান তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত"।[২] এই দুটি হাদিস শরিফ হতে বুঝা যায়, ইসলামি শরিয়ত মানুষকে কর্মের প্রতি ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। আর এটা নর-নারী সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, ইসলাম কীভাবে কর্মের শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেক নবি-রাসুল (আ.) পেশাজীবী ছিলেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "আপনার পূর্বে আমি যে সকল রাসুল প্রেরণ করেছি, তাঁরা সকলেই তো আহার করতেন ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন"।[৩] এর ব্যাখ্যায় ইবন কাসির (১৩০১-১৩৭৩) বলেন, তাঁরা উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই হাট-বাজারে আসা-যাওয়া করতেন। ইসলাম ধর্মের উপর্যুক্ত নির্দেশনা মর্মগত হয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন–

---

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়, পরিচ্ছেদ : নিজ হাতের উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা, হাদিস নং : ২০৭২।

২. সুনানে নাসাঈ, অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়, পরিচ্ছেদ : উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা, হাদিস নং : ৪৪৪৯, ৪৪৫০।

৩. আল্ কোরআন, সূরা ফুরকান : ২০।

"সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।"

ইসলাম অবশ্যই হালাল উপার্জনকেই উৎসাহিত করে, হারাম উপার্জনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মানুষের কর্মের-জীবিকার উদ্দেশ্য হলো উপার্জন করার মাধ্যমে নিজের পরিবারকে স্বচ্ছল করা। আর দারিদ্র্য-অভাব-অনটন দূর করা। দারিদ্র্য হতে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং উম্মতকেও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১] হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, দারিদ্র্য মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।[২] অর্থাৎ দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির দিকে ধাবিত করে (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে)। আবার ভিক্ষাবৃত্তিকেও ইসলাম উৎসাহ দেয় না। এ ব্যাপারে তো আমরা সবাই সে সাহাবির গল্পটি জানি। কবি শেখ হাবিবুর রহমান কত সুন্দর করেই না বর্ণনা করেছেন:

"তিন দিন হতে খাইতে না পাই, নাই কিছু মোর ঘরে,
দারা পরিবার বাড়িতে আমার উপোস করিয়া মরে।
নাহি পাই কাজ তাই ত্যাজি লাজ বেড়াই ভিক্ষা করি.
হে দয়াল নবি, দাও কিছু মোরে নহিলে পরাণে মরি।
আরবের নবি, করুণার ছবি ভিখারিরি পানে চাহি,
কোমল কণ্ঠে কহিল, তোমার ঘরে কি কিছুই নাহি?
বলিল সে, আছে শুধু মোর কম্বল এক খানি,
কহিল রাসুল, এক্ষণি গিয়া দাও তাহা মোরে আনি।

১. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : বিত্‌র সালাত, অনুচ্ছেদ : (আল্লাহ্‌র কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা, হাদিস নং : ১৫৪৩।

২. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ই.ফা, ২০০৪, পৃ. ৭০।

সম্বল তার কম্বল খানি বেচিয়া তাহার করে,
অর্ধেক দাম দিলেন রসুল খাদ্য কেনার তরে।
বাকি টাকা দিয়া কিনিয়া কুঠার, হাতল লাগায়ে নিজে,
কহিলেন যাও কাঠ কেটে খাও, দেখ খোদা করে কী-যে।
সেদিন হইতে শ্রম সাধনায় ঢালিল ভিখারি প্রাণ,
বনের কাষ্ঠ বাজারে বেচিয়া দিন করে গুজরান।
অভাব তাহার রহিল না আর, হইল সে সুখী ভবে,
নবির শিক্ষা করো না ভিক্ষা, মেহনত কর সবে।"
(সূত্রঃ কবি শেখ হাবিবুর রহমান, নবির শিক্ষা কবিতা)

নর-নারী সবার জন্যই কর্মের মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা ইসলামি শরিয়তে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট।

আধুনিক সমাজে শিক্ষিত নারীরা আজ কর্মমুখি। পারিবারিক অসচ্ছলতা দূর করা, নিজের পায়ে দাঁড়ানো ও সমাজ-দেশকে উন্নয়ন-অগ্রগতিতে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যই মূলত নারী সমাজ উপার্জনমুখি কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। বাস্তবতা হলো বৈধ আয়-উপার্জন কর্মে নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। কারণ সমাজে প্রায় অর্ধেক অংশ হলো নারী। আর এই অর্ধেকাংশ সব সময় বাকি অর্ধেকাংশের উপর নির্ভরশীল থাকবে, এটা কখনো বাস্তবসম্মত নয়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবারে একজনের আয়-উপার্জনের উপর নির্ভর করে চলা সম্ভবও হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে। এছাড়াও নারীদের পেশাগত কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অনেকগুলোর আধুনিক দিক রয়েছে বলে গবেষকগণ মনে করেন। সেগুলো হলো–

১. শিক্ষার সর্বজনীনতা, উন্নতি-অগ্রগতি ও বহুমুখিতার কারণে কিছু পেশায় নারীর যথাযথ মূল্যায়ন।

২. রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ও পরিচর্যার কাজে তথা চিকিৎসা ও নার্সিং পেশায় নারীর জন্য বিশেষায়িতকরণ আজ সমাজ ও সময়ের দাবি।

৩. যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে এমন কর্মীর প্রয়োজন হচ্ছে যারা প্রয়োজনের মুহূর্তে মহিলা যাত্রীদের বিশেষ সেবা দিতে পারে।
৪. মহিলাদের প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়-বিক্রয় ও গৃহকর্মে ব্যবহৃত নানারকম তৈজসপত্র তৈরি ও সরবরাহ করতে পারে।
৫. সচ্ছলতা ও পারিবারিক ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য।
৬. নারী শিক্ষা প্রসারের ফলে দিন দিন শিক্ষিকার চাহিদা স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৭. নারীরা যেহেতু সর্বক্ষেত্রে পুরুষের মত কর্মঘন্টা হিসাব করে কাজ করতে সক্ষম নয় এবং তাদের মাতৃত্বকালীন দীর্ঘ ছুটির প্রয়োজন হয়, সেহেতু ঐ সব নারীর স্থানে অন্য নারীদের এনে শূন্যস্থান পূরণ করা হয়।
৮. অধিক সংখ্যক নারী একত্রে কাজ করার ফলে নারীবান্ধব কর্মস্থল সৃষ্টি হয়। যেমন বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস গুলোতে হচ্ছে।
৯. তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা নারীর নিজের সন্তানের ভরণপোষণের জন্য তার অভিভাবকের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তা এড়ানোর জন্য নিজে উপার্জন করতে চেষ্টা করে এবং এমন পরিস্থিতিতে সে উপার্জন কর্মে যোগ দিতে বাধ্য হয়।
১০. সরকারীভাবে উৎসাহ প্রদানের কারণেও নারী সমাজের কর্মস্থলমুখি হওয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ বিষয়ে ইসলামি শরিয়ত কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। এই দিক-নির্দেশনাগুলো অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল ও যুগোপযোগীভাবে উপস্থাপন করেছেন মিশরের বিখ্যাত গবেষক প্রফেসর আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ (রহ.) তাঁর রচিত 'রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' (তাহরীরুল মারআ ফি আসরির রিসালাহ) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। তারই ধারাবাহিকতায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী নারীর পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ইসলামি দিক নির্দেশনাগুলো অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো –

এক.

নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথমত, নারী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় এবং বিয়ের পর তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী– "নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততি সবার তত্ত্বাবধায়ক। সে-ই তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল"।[১] আর দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো যায়। যেমন, সহিহ্ বুখারির হাদিসে এসেছে, "কেউ যদি তার দাসীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শেখায় এবং তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করে, তবে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে"।[২] অন্য এক হাদিসে উল্লেখ আছে, হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা দুটি শিশু কন্যাকে নিয়ে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। আমার কাছে সে সময় একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। তখন সে খেজুরটিকে দুই টুকরা করে দুই কন্যাকে দিয়ে উঠে চলে গেল। এই ঘটনা আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে বললাম। তিনি বললেন, এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি দয়ার আচরণ করে তাহলে তারা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষার অন্তরাল হয়ে যাবে"।[৩] হাদিসে মেয়েদের প্রতি 'ইহ্সান' করার বিষয়টির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবন হাজার আসক্বালানী (১৩৭২-১৪৪৯) যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তার সারমর্ম হলো,

---

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : আহকাম, অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী- হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের (সূরা নিসা:৫৯), হাদিস নং- ৭১৩৮।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : বিবাহ, অনুচ্ছেদ : বন্দি গ্রহণ এবং যে তার দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করে, হাদিস নং : ৫০৮৩।

৩. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, এক টুকরা খেজুর অথবা অল্প কিছু সাদাকা করে হলেও, হাদিস নং : ১৪১৮।

তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা, তাদের বিয়ে দেয়া, তাদের উত্তম রূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করা, তাদের ভদ্রোচিত রীতিনীতি শিক্ষা দেয়া, তাদের প্রতি দয়া ও স্নেহের আচরণ করা, তাদের ভরণপোষণ করা ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সব কাজ করলে মেয়েদের প্রতি ইহ্‌সান করা হবে।

দুই.

নারীর কাজ-কর্মের সময়কে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদনশীল ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা এবং যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্য যে কোন পর্যায়ে কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা যে কোন অবস্থাতেই কর্মহীন ও বেকার না থাকা। গৃহকর্ম সম্পাদনের পর যে বাড়তি সময় থাকবে তা পেশাগত বা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে। কারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি মূহূর্তের হিসাব তার প্রতিপালকের সামনে দিতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– "পুরুষ বা নারী যে-ই ভাল কাজ করবে, সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ার পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং আখেরাতে প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে"।[১]

হযরত আবু বায়যা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "বান্দা তার আয়ুষ্কাল কীভাবে ব্যয় করেছে, অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কী কাজ করেছে, অর্থ-সম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে ও কী কাজে তা ব্যয় করেছে এবং দৈহিক শক্তিকে কী কাজে নিয়োজিত রেখেছে সে সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে তার পা দুটি সরিয়ে নিতে পারবে না।[২]

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নাহল : ৯৭।

২. সুনানে তিরমিযী, অধ্যায় : কেয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়, পরিচ্ছেদ : কেয়ামত প্রসঙ্গ, হাদিস নং : ২৪১৭।

তিন.

স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করবে আর পিতা তার কন্যার। কিন্তু কোন মহিলার যদি এমন অবস্থা হয় যে তার অভিভাবক হিসেবে এদের কেউ নেই তবে তার ব্যয় বহন করবে রাষ্ট্র। এই তিনটি বিষয়ের দলিল নিচে উল্লেখ করা হলো−

স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করবে− মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "পুরুষ নারীর জন্য ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং এজন্য যে পুরুষ নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে..."।[১] মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, "তাদের (স্ত্রীদের)−কে খাদ্য ও বস্ত্র উত্তমরূপে দেওয়া তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য..."।[২]

পিতা তার কন্যার ব্যয় নির্বাহ করবে। হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"... নিজের পরিবার থেকে (ব্যয়) শুরু কর। এটা কি ভাল কথা যে স্ত্রী বলবে, হায়! আমাকে খাবার দাও, নতুবা তালাক দাও...সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিলে আমাকে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ?"[৩] রাষ্ট্র ব্যয় নির্বাহ করবে− হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও আপন। মুমিনদের কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার, আর কেউ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা তাঁর ওয়ারিশদের জন্য"।[৪] অন্য একটি রেওয়ায়েতে

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৩৪।

২. সহিহ্ মুসলিম, অধ্যায় : হজ, পরিচ্ছেদ : নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হজের বিবরণ, হাদিস নং-২৮৪০।

৩. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : ভরণ-পোষণের ব্যয় এবং পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করার মর্যাদা, পরিচ্ছেদ : পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব, হাদিস নং : ৫৩৫৫।

৪. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায়- ভরণ-পোষণের ব্যয় এবং পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করার মর্যাদা, পরিচ্ছেদ- নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী− (ঋণের) কোন বোঝা অথবা সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে, তার দায়-দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত, হাদিস : ৫৩৭১।

আছে, “অপর কেউ অভাগী সন্তান রেখে গেলে তার দায়িত্ব আমার”।[১] হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই নিজের অধিনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষের উপর যিনি শাসক নিযুক্ত হয়েছেন তিনিও একজন তত্ত্বাবধায়ক। ফলে তিনিও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন”।[২] সহিহ্ বুখারির অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত উমর (রাদ্বি.) এক বিধবা-অভাবী মহিলাকে একটি উট, খাদ্যভর্তি দু'টি বস্তা, কিছু নগদ টাকা ও কাপড়-চোপড় দেন।[৩]

চার.

পুরুষ পরিবারের ব্যবস্থাপক তাই স্ত্রীগণ পেশাগত কাজের জন্য পুরুষের অনুমতি নেবে। অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি নেবে এবং কন্যা তার পিতার অনুমতি নেবে। মহান আল্লাহ্র বাণী– “পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক”।[৪] হযরত ইবন উমর (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “পুরুষ তার পরিবারের লোকদের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...”।[৫]

শরিয়ত ও প্রথাগত বিধান উভয়ই পুরুষকে পরিবারের নেতৃত্ব এবং পেশাগত কাজে স্ত্রী-কন্যাকে অনুমতি দানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করেছে। অর্থাৎ স্ত্রী-কন্যা পেশাগত কাজ করার জন্য পরিবারের অভিবাবক পুরুষের অনুমতি নেবে। তবে শরিয়তের কোন বিধান বা বৈধতা ছাড়া পরিবারের অভিবাবক পুরুষ

---

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, খরচ করা থেকে বিরত থাকা এবং দরিদ্র হওয়া, পরিচ্ছেদ : ঋণ রেখে মৃত্যুবরণকারীর জানাযা, হাদিস নং : ২৩৯৮।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : দাস মুক্ত করা, পরিচ্ছেদ : দাসদাসীর উপর হাত তোলা, হাদিস নং : ২৫৫৪; সহিহ্ মুসলিম।

৩. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : মাগাযী, অনুচ্ছেদ : হুদায়বিয়া অভিযান, হাদিস নং : ৪১৬০।

৪. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৩৪।

৫. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : দাস মুক্ত করা, পরিচ্ছেদ : দাসদাসীর উপর হাত তোলা, হাদিস নং : ২৫৫৪; সহিহ্ মুসলিম।

নারীকে সমাজের জন্য কোন কল্যাণকর কাজে স্বেচ্ছাচারিতামূলক বাধা দিতে পারবে না, আবার বিনা প্রয়োজনে বৃত্তিমূলক কোন কাজ গ্রহণে বাধ্য করতেও পারবে না।

পাঁচ.

মুসলিম নারীর নিজের সতীত্ব-পবিত্রতা রক্ষা এবং পবিত্র-চরিত্রবান সমাজ গঠনের জন্য অবিলম্বে বিয়ে করা বৈধ, বরং অত্যাবশ্যক। এভাবে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মুসলিম সমাজের সদস্যরা সুন্দর মানসিকতা ও উত্তম নৈতিক চরিত্র ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে পারে। পেশাগত কাজ যদি কোন নারীকে বিবাহ থেকে বিরত রাখে কিংবা বিনা প্রয়োজনে বিলম্বিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা নারীর জন্য অবশ্যই অপছন্দনীয় হবে। অপর দিকে কোন পেশাগত কাজ যদি তার বিবাহ সম্পাদনের সহায়ক হয় তা হলে তা তার জন্য বৈধ ও পছন্দনীয় কাজ হবে।

বিয়ে করা রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ্। হযরত আনাস ইবন মালেক (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "....আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের মধ্যে আমি আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি এবং অধিক তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি কখনো রোযা রাখি, আবার কখনো রাখি না। আমি (রাত জেগে) নামায পড়ি, আবার ঘুমাই এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এসবই আমার সুন্নাহ্ (রীতিনীতি)। যারা আমার সুন্নতকে পরিত্যাগ করে তারা আমার নয়"।[১] অন্য হাদিসে এসেছে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "হে যুবক সমাজ, যাদের বিয়ে করার সামর্থ রয়েছে, তাদের বিয়ে করা উচিৎ। কারণ তা দৃষ্টি অবনতকারী এবং গুপ্তাঙ্গের হিফাজতকারী"।[২]

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : বিয়ে-শাদী, পরিচ্ছেদ : বিয়ে করার অনুপ্রেরণা দান, হাদিস নং : ৫০৬৩; সহিহ্ মুসলিম।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : বিয়ে-সাদী (এই হাদিসটি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম)।

আর মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে হাদিস শরিফে এসেছে, হযরত উর্ওয়া ইবন যুবায়ের (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রাদ্বি.)-কে মহান আল্লাহ্র বাণী– "তোমরা যদি এ আশংকা বোধ কর যে, ইয়াতিমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা অন্য পছন্দনীয় নারীকে বিয়ে কর"[১] –এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "হে ভাগ্নে, আয়াতে উল্লেখিত এসব ইয়াতিম তাদের অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হতো। অভিভাবকগণ তাদের রূপ-লাবণ্য ও সহায়-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে মোহরানা হ্রাস করে তাদেরকে বিয়ে করতে চাইতো। ফলে পূর্ণ মোহরানা প্রদান করে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদের বাদ দিয়ে অন্য মেয়েদের বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে"।[২]

উক্ত আয়াতে করিমা এবং হাদিস শরিফে যেহেতু ইয়াতিমদের বিয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাই এর মধ্যে অবিলম্বে কন্যাদের বিয়ে দেয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে ফকিহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, মেয়েদের বিয়ে কি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে দেবে না-কি পরে দেবে? প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে বিয়ে দেয়ার মতটি অধিক নির্ভুল ও বিশুদ্ধতম। এটা এই কারণে যে যাতে তাদের সতীত্ব সুরক্ষিত করা যায় এবং পূর্ণ পবিত্রতা সাধন হয়, মানসিক স্বাস্থ্য পূর্ণতা লাভ করে। তাই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটাকে উৎসাহিত করেছেন।

ছয়.

পারিবারিক-আর্থিক সামর্থ ও সমাজের গণ্ডির মধ্যে মুসলিম নারী সন্তান জন্মদানে উৎসাহী হবে। পেশাগত কাজের কারণে এ দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা মোটেই সমীচীন নয়। মহান আল্লাহ্র বাণী– "আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতির স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পুত্র-

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৩।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : বিয়ে-শাদী, পরিচ্ছেদ : ইয়াতিম বালিকার বিয়ে দেওয়া, হাদিস নং : ৫১৪০।

পৌত্রাদি দান করেছেন”।[১] রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “হে জাবের, সন্তান কামনা কর! সন্তান কামনা কর!”।[২] এই হাদিসে ব্যবহৃত আরবি শব্দ হলো ‘আল কায়েস’ অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও। ইমাম বুখারি এর অর্থ করেছেন– সন্তান কামনা কর। অন্য হাদিসে আল্লাহ্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা অধিক স্নেহশীল ও সন্তান উৎপাদনকারী মহিলাকে বিয়ে করো। আমি কেয়ামত দিবসে তোমাদের সংখ্যাধিক্যে গর্ব করবো”।[৩]

সাত.

নারী তার ঘর ও সন্তানাদি উত্তমরূপে দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। বিবাহিত নারীর জন্য এটি প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য পেশাগত কাজ পরিত্যাগ করা সংগত।

মহান আল্লাহ্র বাণী– “তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে এ বিষয়টি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি হয়”।[৪] হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে”।[৫] হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “উটের পিঠে আরোহণকারী আরব মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম।

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নাহল : ৭২।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : বিয়ে-শাদী, পরিচ্ছেদ : সন্তান কামনা করা, হাদিস নং : ৫২৪৫; সহিহ্ মুসলিম।

৩. সুনানে নাসাঈ, অধ্যায় : বিয়ে-শাদী, পরিচ্ছেদ : বন্ধ্যা নারীকে বিবাহ করা অপছন্দনীয়, হাদিস নং : ৩২২৭।

৪. আল্ কোরআন, সূরা রুম : ২১।

৫. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : দাস মুক্ত করা, পরিচ্ছেদ : দাসদাসীর উপর হাত তোলা, হাদিস নং : ২৫৫৪; সহিহ্ মুসলিম।

যারা নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল ও স্বামীর সম্পদের হিফাজতকারী”।[১]

নারী-পুরুষ ও শিশু সবারই শান্তি, স্বস্তি ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের অফুরন্ত ভালোবাসার ছায়ায় মানসিক ও স্নায়বিক শান্তি লাভের স্থান হলো নিজ পরিবার। এতে তাদের পেশাগত জীবন ও পারিবারিক জীবন উভয়টি সুন্দর ও সুখ-শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হবে। শিশুদের বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন পারিবারিক যত্ন ও তত্ত্বাবধান। যেমন, সন্তানের প্রয়োজন মায়ের স্তন্যপান এবং কমপক্ষে তিন বছর লালন-পালন। সব মিলিয়ে একজন নারী স্ত্রী হিসেবে এবং একজন মা হিসেবে একটি পরিবারের পরিবেশকে তার সদস্যদের জন্য আনন্দদায়ক, ভালোবাসায় ভরপুর ও স্নেহ-মমতার আধারে পরিণত করতে পারেন। তাই নারীকে পেশাগত কাজ করার সময় হিসেবী পদক্ষেপ নিয়ে এবং ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। যাতে তার গৃহের দায়িত্বে অবহেলা না হয়। আবার পেশাগত কাজেও যেন ব্যাঘাত না হয়। পেশাগত কাজের চাকচিক্য, বাহ্যিক জৌলুস যেন তাকে তার প্রকৃত জীবন, পবিত্র দায়িত্ব ও মৌলিক ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন করতে না পারে।

আট.

দুই অবস্থায় পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ করা নারীর জন্য অত্যাবশ্যক–

১. পরিবারের জন্য উপার্জনক্ষম ব্যক্তির (পিতা, স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা তার অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য।

২. মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের জন্য সমাজের কল্যাণে নারীদের ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজসমূহে অংশগ্রহণ করার সময়। এ

---

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : ভরণ-পোষণ, পরিচ্ছেদ : স্বামীর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও তার ব্যয় নির্বাহ করা, হাদিস নং : ৫৩৬৫।

অবস্থায় করার সময়। এ অবস্থায় পরিবার-সন্তান-সন্ততির প্রতি দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ যথাসম্ভব আঞ্জাম দেয়ার জন্য নারীগণ চেষ্টা করবে।

প্রথমত: নিজের ও সন্তান-সন্ততির জীবিকার জন্য নারীর পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন, হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ্ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার বাসস্থান থেকে খেজুর আহরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে এক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলে তিনি নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে তা অবহিত করলেন। এতে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি বাগান থেকে খেজুর আহরণ করো"।[১] এ বিষয়ে সহিহ্ বুখারীর একটি হাদিস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি দয়ার আচরণ করে তাহলে তারা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষার অন্তরাল হয়ে যাবে।

যদি কারও স্বামী জীবিত থাকে এবং কর্মক্ষম না থাকে, তবে স্ত্রী কি তাকে তালাক দিতে পারবে? এ ব্যাপারে ফকিহ্গণের বিজ্ঞ মত হলো, স্বামীকে সে তালাক না দেওয়া বা ত্যাগ না করাই তার জন্য উত্তম। কারণ মহান আল্লাহ্ হকের অধিকারীর উপর ধৈর্য্যধারণ অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন এবং সে যদি অধিকার ত্যাগ করে তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য করেছেন। এসময় স্বামীর উচিৎ তাকে জীবিকা উপার্জনের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া। স্ত্রী তার উপার্জন হতে স্বামী ও সংসারের খরচ বহন করবে। [এ বিষয়ে হযরত আইয়ুব (আ.)-এর অসুস্থতাকালীন সময়ে হযরত বিবি রহিমা (আ.)-এর জীবিকা উপার্জনের ঘটনা একটি উপমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে।]

অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভ করে সম্পদশালী হয় অথবা নিজে কোন কাজ করে সম্পদশালী হয়, তখনও একই হুকুম হবে।

---

১. সহিহ্ মুসলিম, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং বিধবার জন্য ইদ্দত পালনকালে প্রয়োজনে দিনের বেলায় ঘরের বাইরে যাওয়া জায়েয, হাদিস নং : ৩৬১৩।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের জন্য নারীদের ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজসমূহে অংশগ্রহণ করার সময়। প্রকৃতপক্ষে 'ফরযে কিফায়া' হলো, যে ফরয কয়েকজন আদায় করলে সবার পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়, আর কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হয়। এক্ষেত্রে পেশাগত কাজটি যদি– ১. সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, ২. এমন প্রয়োজন যাতে নারী সমাজের জন্য তা করা অত্যাবশ্যকীয় হয়, ৩. যদি তা এককভাবে নারীদেরই দায়িত্বভূক্ত হয় এবং ৪. যদি তা পুরুষের কাজ ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে পুরুষের পক্ষে এখন তা আর এককভাবে করা সম্ভব নয়– তাহলে সমাজের প্রয়োজনের বিবেচনায় ঐ সব কাজ আঞ্জাম দেয়া নারীর জন্য ফরযে কিফায়া। যেমনঃ নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা-নার্সিং, শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান, ইয়াতিমদের তত্ত্বাবধান, শিশু সংশোধন কেন্দ্র এবং অনুরূপ সমাজসেবামূলক কাজ।

আর ফরযে কিফায়া আদায় করার মাধ্যমে অন্য সবাইকে দায়িত্ব হতে মুক্ত করা হয়। তাই এর দ্বারা বিশেষ সওয়াব লাভ করা যায়।

নয়.

পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজ নারীর জন্য 'মানদূব' (মুস্তাহাব, নফল)– ১. দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা, ২. সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা, ৩. কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

প্রথমতঃ দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাস্‌উদ (রাদ্বি.)-এর স্ত্রী হযরত যয়নাব (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত বেলাল (রাদ্বি.) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও আমার কোলের ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে সাদাকা (ব্যয়) করছি তা কি

আমার জন্য যথেষ্ট হবে? আমরা তাঁকে একথা বললাম যে, নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমাদের নাম বলবেন না। তখন হযরত বেলাল (রাদ্বি.) নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মহিলাটি কে? হযরত বেলাল বললেন, যয়নাব। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কোন যয়নাব? হযরত বেলাল (রাদ্বি.) বললেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাস্উদ (রাদ্বি.)-এর স্ত্রী। তখন রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ! সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। আত্মীয়তার (অধিকার রক্ষার) পুরস্কার ও দান করার পুরস্কার। অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তুমি যে দান করবে, তোমার স্বামী ও সন্তানই তা পাওয়ার অধিক হকদার"।[১] উল্লেখ্য, হযরত যয়নাব (রাদ্বি.) হস্তশিল্পে পারদর্শী একজন মহিলা সাহাবি ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করার বিষয় হলো যেমন, ঐ সব মহিলা যাঁদের মহান আল্লাহ্ তায়ালা সবিশেষ প্রতিভা, যোগ্যতা ও মমতা দান করেছেন। যেমনঃ চমৎকার বাকপটুতার অধিকারী মহিলাদের উন্নতমানের উপদেশপূর্ণ, মর্মস্পর্শী কথা বা বচনশৈলী ও জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্য, কিংবা কেউ এমন কোন কাজে দক্ষ যে তা সহজেই অন্য নারীকে শেখাতে পারে। এ সব সহজাত অতুলনীয় মেধা ও যোগ্যতার পরিচর্যা প্রয়োজন যাতে তারা ঐ সবের উপযুক্ত ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। এই সব সহজাত মেধা ও যোগ্যতা মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অনেক পুরুষের চেয়েও অধিক সুফল বয়ে আনে। এক্ষেত্রে আরও একটি উদাহরণ হলো, আত্মসংবৃত (অটিস্টিক) শিশুর যত্নের ক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়তঃ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা– হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "... আমাদের মধ্যে দীর্ঘ হাতের অধিকারিণী ছিলেন হযরত

---

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : যাকাত, পরিচ্ছেদ : স্বামী ও পোষ্য ইয়াতিমকে যাকাত দেয়া, হাদিস নং : ১৪৬৬; সহিহ্ মুসলিম।

যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাদ্বি.)। কারণ তিনি নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং দান করতেন”।[১] হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, “... দ্বীনের ব্যাপারে হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাদ্বি.)-এর চাইতে উত্তম কোন নারী আমি দেখিনি। তিনি সর্বাধিক খোদাভীরু, সত্যবাদী, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ও দানশীল ছিলেন এবং নিজেকে অধিক মাত্রায় এমন কাজে নিয়োজিত রাখতেন, যার উপার্জন থেকে দান করতেন এবং তার সাহায্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে প্রয়াসী থাকতেন”।[২]

দশ.

পেশাগত কাজের চাপ বেশি থাকলে ঘরকন্নার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা স্বামীর জন্য উত্তম। কিন্তু পেশাগত কাজটি যদি অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণির হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে সাহায্য করাও স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “... আর পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে”। হযরত আসওয়াদ ইবন ইয়াজীদ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি হযরত আয়েশা (রাদ্বি.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়িতে কী কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজে সাহায্য করতেন এবং আযান হলে বেরিয়ে যেতেন”।[৩] এছাড়াও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই তাঁর বকরী দুধ দোহন করতেন। নিজের কাজ নিজে করতেন। কাপড় সেলাই করতেন। নিজের জুতা

১. সহিহ্ মুসলিম, অধ্যায় : সাহাবিগণের ফযিলত, পরিচ্ছেদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা.)-এর ফযিলত, হাদিস নং : ৬২১০।

২. সহিহ্ মুসলিম, অধ্যায় : সাহাবিগণের ফযিলত, পরিচ্ছেদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ফযিলত, হাদিস নং : ৬১৮৪।

৩. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : ভরণ-পোষণ, পরিচ্ছেদ : নিজ পরিবারে গৃহকর্তার কাজকর্ম, হাদিস নং : ৫৩৬৩।

জুতা মেরামত করতেন এবং অন্যান্য পুরুষরা বাড়িতে যে কাজ করে থাকে তিনিও তাই করতেন[১]। তিনি এসব করতেন গৃহের কাজের জন্য স্ত্রীদের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, সুতরাং নারী পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকলে সে ক্ষেত্রে পুরুষের তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের তিনটি আয়াত আমরা উপস্থাপন করছি– ১. "নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর",[২] ২. "নারীদেরও পুরুষের উপর ঠিক তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে পুরুষদের নারীদের উপর",[৩] ৩. "কোন প্রাণসত্তার অধিকারীর উপর আল্লাহ্ তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না"।[৪]

এগার.

স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খরচ করবে। ইবন আব্বাসের (রাদ্বি.) আজাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মায়মূনা বিনতে হারেস (রাদ্বি.) তাকে জানালেন যে, "তিনি তার এক দাসীকে দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত করে দিয়েছিলেন কিন্তু সে ব্যাপারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুমতি নিতে পারেননি। অতঃপর তার পালার দিনে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে আসলেন। তিনি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কি জানেন যে আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি একাজ করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যদি তুমি দাসীটিকে তোমার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে তাহলে সর্বাধিক পুরস্কার লাভ করতে"।[৫]

---

১. আহমদ, সহিহ্ আল্ জামে আস্ সগির।

২. আল্ কোরআন, সূরা মায়েদা : ২।

৩. আল্ কোরআন, সূরা বাক্বারা : ২২৮।

৪. আল্ কোরআন, সূরা বাক্বারা : ২৮৬।

৫. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : দান, এর ফযিলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান, পরিচ্ছেদ : স্বামী আছে এমন নারীর স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য হিবা করা বা দাস মুক্ত করা, নির্বোধ না হলে বৈধ, নির্বোধ হলে অবৈধ, হাদিস নং : ২৫৯২; সহিহ্ মুসলিম।

বিভিন্ন কাজে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতি প্রশংসনীয় ব্যাপার। যে পরিবারে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ রয়েছে, সে পরিবারে পারস্পরিক সম্মতিই এসবের মূল। হযরত মায়মুনা (রাদ্বি.)-এর এই হাদিস হতে বুঝা যায় যে মহিলারা তাদের উপার্জন ব্যয় করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর পূর্বে উল্লিখিত হযরত ইবন মাস্উদের স্ত্রী (রাদ্বি.)-এর ঐ হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, স্বামীকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করা 'মানদূব' (মুস্তাহাব)। আর স্ত্রী যখন পেশাগত কাজে আত্মনিয়োগ করে তখন এটার জন্য স্বামীকেও কিছু কষ্ট পোহাতে হয়। আর যদি স্ত্রী তার সম্পূর্ণ সময় গৃহস্থালী কাজে ব্যয় করতো তবে স্বামীকে হয়তো এই কষ্ট পোহাতে হতো না। তাই স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে কিছু অংশ স্বামীর এই কষ্টের বিনিময়ও হওয়া উচিত। পরস্পরের ভালোবাসা বিশ্বাস-ভক্তি-প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধির জন্য এই সম্মতি-আলোচনা-অনুভূতি ব্যক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

বার.

যে সব উদ্যোগ কর্মজীবী মহিলাদের তাদের পারিবারিক সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে, তা গ্রহণ করা এবং যা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা দূর করার জন্য সামগ্রিকভাবে-সমাজ দায়ী। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– "মু'মিন নারী ও পুরুষরা পরস্পরের বন্ধু"।[১]

হযরত নু'মান ইবন বশীর (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তুমি ঈমানদারদেরকে পারস্পরিক দয়া-মায়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে"।[২]

মুসলিম নারীরা পেশাগত কাজ করতে গিয়ে গৃহের তত্ত্বাবধান ও সন্তানদের পরিচর্যাসহ সব কাজের সমন্বয় করতে গিয়ে যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় বা হচ্ছে তা থেকে উত্তরণের ব্যাপারে মুসলিম সমাজ তথা এর জনগণ, প্রতিষ্ঠান

---

১. আল্ কোরআন, সূরা তওবা : ৭১।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছেদ : মানুষ ও জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন, হাদিস নং : ৬০১১; সহিহ্ মুসলিম।

ও বুদ্ধিজীবীগণ দায়ী থাকবেন। এজন্য অনেকগুলো উদ্যোগ নেয়া যায়। যেমনঃ ১. নারীর গৃহ ভিত্তিক পেশাগত কাজে সহযোগিতা করা, সুযোগ সৃষ্টি করা ও উৎসাহ দেয়া, ২. গৃহভিত্তিক কাজ ও গৃহকর্ম করার সুবিধা হয় বা সুযোগদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

তের.

নারীর বৃত্তিমূলক কাজের ব্যাপারে সরকার দুটি মৌলিক বিষয়ে দায়িত্বশীল– ১. সরকারী কাজে নিয়োজিত বিবাহিত পুরুষদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে, যাতে তাদের পরিবার স্বচ্ছল হয় এবং তাদের স্ত্রীদের পেশাগত কাজে অংশ নিতে না হয়। ২. সরকারের অধীনে কোন বৃত্তিমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

আর হাদিসে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

চৌদ্দ.

যে সব পেশাগত কাজ নারীর প্রকৃতি এবং তার দৈহিক-মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল তা থেকে নারীকে রক্ষা করতে হবে। তা দু'ধরনের– ১. শরিয়ত সে সব বৃত্তিমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে। হযরত আবু বাকরাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যারা তাদের কাজ কারবারের কর্তৃত্ব একজন মহিলার উপর ন্যস্ত করলো"।[১] (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে)। ২. মুসলমানগণ যে সব কাজে নিয়োগ থেকে নারীদের বিরত রাখতে চায়, এর মধ্যে পড়ে এমন সব কষ্টকর দৈহিক কাজ যা চরম শ্রম দাবি করার সাথে সাথে নারীর কাঁধে

---

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : মাগাযি, পরিচ্ছেদ : পারস্যের কিসরা ও রোমের অধিপতি কায়সারের কাছে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্র প্রেরণ, হাদিস নং : ৪৪২৫।

ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়। তা ছাড়া যে কাজ কষ্টদায়ক মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না এবং যা এমন রূঢ়তা ও কঠোরতার দাবি করে যা তার আবেগ অনুভূতিকে নিস্তেজ করে দেয়। যা একাধারে করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এক কথায় তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে।

পনের.

পেশাগত কাজে নারীর অংশগ্রহণ যে ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাক্ষাতের দাবি করে সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর অংশগ্রহণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে। ঐ সব নিয়ম-নীতির মধ্যে রয়েছে– শালীন পোশাক পরা, দৃষ্টি অবনত রাখা, নিভৃতে সাক্ষাত না করা এবং ভিড় এড়িয়ে চলা। অনুরূপ বার বার দীর্ঘ সময় ধরে দেখা-সাক্ষাত বর্জন করা অর্থাৎ প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কাজের পুরো সময়টাতে নারী ও পুরুষকে একত্রে একই স্থানে রাখা থেকে বিরত থাকা। তবে কাজের প্রকৃতিই যদি পরস্পর সহযোগিতা ও মত বিনিময় অথবা অন্য কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে নারী পুরুষে পুনঃ পুনঃ পরস্পর দেখা-সাক্ষাত দাবি করে তাহলে প্রয়োজন অনুসারে তা করতে কোন ক্ষতি নেই।

বর্তমানে যে সব বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে তাতে যদি এসব নিয়ম-নীতির কিছু অভাব থাকে তাহলে কি আমরা নারী অথবা সমাজের জন্য কল্যাণকর দিকসমূহ পরিত্যাগ করবো এবং মুসলিম নারীদের ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেব? নাকি শরিয়ত নির্দেশিত নিয়ম-কানুন পালন করার যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করব? এ বিষয়ে প্রফেসর আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ বলেন, “ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় প্রতিরোধের প্রয়োজন কতটা এবং তা প্রতিরোধ করার পর কতটা কল্যাণ অর্জিত হবে তা পরিমাপ করা শরিয়তের মূলনীতি অনুসারে ওয়াজিব।”

শরিয়তের অন্যতম মূলনীতি হলো, একই কাজে যখন বিপর্যয় ও কল্যাণ একসাথে দেখা দেবে তখন অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে। তবে, কল্যাণ সাধনের চেয়ে বিপর্যয় ঠেকানো উত্তম।

একনজরে এই দিক নির্দেশনা হলো–

১. নারীকে পর্যাপ্ত-উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে ইসলামি শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথম বিষয়টি হলো, নারী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধান এবং বিয়ের পর তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা। যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো যায়।

২. নারীর কাজ-কর্মের সময়কে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদন ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা এবং যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্য যে কোন পর্যায়ে এবং কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা যে কোন অবস্থাতেই কর্মহীন ও বেকার না থাকা।

৩. স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করবে আর পিতা তার কন্যার। কিন্তু কোন মহিলার যদি এমন অবস্থা হয় যে তার অভিভাবক হিসেবে এদের কেউ নেই, তবে তার ব্যয় বহন করবে রাষ্ট্র।

৪. পুরুষ পরিবারের ব্যবস্থাপক, তাই স্ত্রীগণ পেশাগত কাজের জন্য পুরুষের অনুমতি নেবে। অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি নেবে এবং কন্যা তার পিতার অনুমতি নেবে।

৫. মুসলিম নারীর নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং পবিত্র ও চরিত্রবান সমাজ গঠন করার জন্য বিয়ে করা বৈধ, যা অত্যাবশ্যক কাজও বটে।

৬. পারিবারিক-আর্থিক সামর্থ্য ও সমাজের গণ্ডির মধ্যে মুসলিম নারী সন্তান জন্মদানে উৎসাহী হবে। পেশাগত কাজ তাকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখুক তা মোটেই সমীচীন নয়।

৭. নারী তার ঘর ও সন্তানাদির উত্তমরূপে দেখা-শোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। বিবাহিত নারীর জন্য এটি প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য পেশাগত কাজ পরিত্যাগ করা সংগত।

৮. দুটি অবস্থায় পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ করা নারীর জন্য অত্যাবশ্যক।

ক. পরিবারের জন্য উপার্জনক্ষম ব্যক্তির (পিতা, স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা তার অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য।

খ. মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্তে নারীদের জন্য ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজসমূহ আদায় করার সময়।

৯. পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজ নারীর জন্য 'মানদুব' (মুস্তাহাব)–

ক. দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা,

খ. মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা,

গ. কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

১০. পেশাগত কাজের চাপ বেশি থাকলে ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা স্বামীর জন্য উত্তম। কিন্তু পেশাগত কাজটি যদি অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণির হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে সাহায্য করাও স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, স্ত্রীকে অবশ্যই কাজটি করতে হবে, সে ক্ষেত্রে স্বামীর জন্যও ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা আবশ্যক। তা না হলে ঘরে-বাইরে উভয় দিকে কাজ করা স্ত্রীর জন্য কষ্টসাধ্য হবে।

১১. স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খরচ করবে।

১২. যেসব উদ্যোগ কর্মজীবী মহিলাদেরকে তাদের পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে তার প্রস্তুতির জন্য সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজ দায়ী।

১৩. নারীর বৃত্তিমূলক কাজের ব্যাপারে মুসলিম সরকার দুটি মৌলিক বিষয়ে দায়িত্বশীল–

ক. সরকারী কাজে নিয়োজিত বিবাহিত পুরুষদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে, যাতে তাদের পরিবার সচ্ছল হয় এবং তাদের স্ত্রীদের পেশাগত কাজে অংশ নিতে না হয়।

খ. সরকারের অধীনে কোন বৃত্তিমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪. যে সব পেশাগত কাজ নারীর প্রকৃতি এবং তার দৈহিক-মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল, তা থেকে নারীকে রক্ষা করতে হবে। এ ধরনের কাজ দুই প্রকার– ক. শরিয়ত সে সব বৃত্তিমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে। খ. সাধারণভাবে যে সব কাজে নিয়োগ থেকে নারীদের বিরত রাখা যায়।

১৫. পেশাগত কাজে নারীর অংশগ্রহণ যে ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাক্ষাতের দাবি করে সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর অংশগ্রহণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে।

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও ইসলাম

সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম যথাযথ ও জুতসই দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। একজন নারী বিভিন্নভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারে। যেমন– উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি, বিয়ের সময় প্রাপ্ত দেন-মোহর, উপহার হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তি ইত্যাদি। এইসব সম্পত্তিতেই নারীর অধিকার সুনিশ্চিত ও নির্ধারিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– "হে বিশ্বাসীগণ, যে সব বিষয়ে আল্লাহ্‌ তোমাদের একে অপরের তুলনায় অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন, তোমরা সে ব্যাপারে লোভাতুর হয়ো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা পুরুষ পাবে, আর নারী যা অর্জন করে তা নারী পাবে। সবসময় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে সবকিছু জানেন"।[১] নারীর অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার সম্পত্তিতে অধিকার। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও নারী

সব ধন-সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌। কোরআনের বাণী– "মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র"।[২] তিনিই মানুষকে সাময়িকভাবে এই সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছেন। যেহেতু তিনিই প্রকৃত মালিক তাই সম্পত্তি বণ্টনের নীতি প্রদানও তাঁর অধিকার। সম্পত্তি বণ্টনের এই যথাযথ নিয়ম-পদ্ধতি পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তায়ালা সেখানে যাদেরকে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছেন এবং যার জন্য যতটুকু অংশ নির্ধারণ করেছেন সে ততটুকু সম্পদের মালিক হবে।

---

১. আল্‌ কোরআন, সূরা নিসা : ৩২।

২. আল্‌ কোরআন, সূরা বাক্বারা : ২৮৪।

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করার এ নিয়মকে ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় 'ফারাইয' বলা হয়। ইসলামি আইন শাস্ত্রে এ সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে। একে বলা হয় 'ইলমুল ফারাইয'। সাধারণভাবে 'ফারাইয' শব্দটি 'ফরিদ্বাতুন'-এর বহুবচন। যার আভিধানিক অর্থ– নির্ধারণ করা, চূড়ান্ত রূপে স্থির করা, ফরয, নির্দিষ্ট অংশ, সম্পত্তির অংশ ইত্যাদি। আর যে শাস্ত্র 'ফারাইয' নিয়ে আলোচনা করে তাকে 'ইলমুল ফারাইয' বলে। সুতরাং 'ইলমুল ফারাইয'-এর আলোচ্য বিষয় মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি, তার উত্তরাধিকারী এবং তাদের প্রাপ্য অংশ। আর এর উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করা। মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ধন-সম্পদকে আরবিতে বলা হয় 'মিরাস' বা 'তরকা'। আর উত্তরাধিকারীর আরবি প্রতিশব্দ হলো, 'ওয়ারিস'। যার মৃত্যুর কারণে অন্যরা ওয়ারিস হয় তাকে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুরিস'। তাই আমাদের দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিকে 'মুরিসি' সম্পত্তি বলা হয়।

'মুরিসি' সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ সবার অধিকার রয়েছে, তা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে– "পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্প হোক বা বেশি, এ অংশ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত"।[১] আয়াতের অর্থালোকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারীর নির্ধারিত অংশ

উত্তরাধিকারী কে কে এবং তাদের নির্ধারিত অংশ কতটুকু তা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী- "আল্লাহ্‌ তোমাদের সন্তানদের (সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তি) সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন: এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান, শুধু মেয়ে দুই-এর বেশি রেখে গেলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি কেবল এক মেয়ে থাকে তবে সে পাবে

১. আল্‌ কোরআন, সূরা নিসা : ৭।

অর্ধেক। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে যদি শুধু পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তবে মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ; কিন্তু যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ; অবশ্য এ সবই হবে মৃত ব্যক্তির অসিয়তের দাবি পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশি আপন, তা তোমরা জানো না। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তারা নিঃসন্তান হয়। তাদের সন্তান থাকলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে, অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে স্ত্রীরা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি একটি সন্তান থাকে তবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ স্ত্রীরা পাবে, তোমাদের অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা নিঃসন্তান হয় এবং মা-বাবাও মারা গিয়ে থাকে কিন্তু এক ভাই বা বোন জীবিত থাকে তবে তারা প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, আর যদি তারা সংখ্যায় বেশি হয় তবে তারা এক তৃতীয়াংশ পাবে, তবে সবটাই হবে অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর কারও অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল। (উত্তরাধিকারের ব্যাপারে) এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল সাফল্য। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর বিধান লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে জ্বলবে চিরকাল। তার জন্য অপেক্ষা করছে অপমানজনক শাস্তি”।[১] “অনেকেই আপনার কাছে বণ্টন-বিধান সম্পর্কে জানতে চায়। হে নবি, তাদের বলে দিন, আল্লাহ্ বিধান দিচ্ছেন যে, যদি কোন নিঃসন্তান ব্যক্তি মারা যায় যার মা-বাবা মারা গেছে, তার একজন বোন থাকলে সেই বোন তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ১১-১৪।

আর বোন যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে তারা সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাইবোন থাকে তবে বোনেরা একভাগ আর ভাইয়েরা দুভাগ পাবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আর আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন"।[১]

পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতগুলোতে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস কারা এবং তাদের কার কত অংশ তা স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কিছু বিষয় জেনে রাখা জরুরি।

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি দু'ধরনের হতে পারে– ১. তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র, যেমন– পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈজসপত্র, অলংকার-অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। ২. বিষয়-সম্পত্তি, যেমন– জমি-জমা, টাকা-পয়সা, ব্যবসার মালামাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এই দু'ধরনের সম্পদের সবগুলোই তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বা মিরাস হিসেবে গণ্য হবে। আর মৃত ব্যক্তির জীবিত ওয়ারিসগণ শুধু এই সম্পত্তি পাবে।

তবে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টনের আগে তিনটি কাজ করতে হবে। সেগুলো হলো–

১. তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে কোন ক্রুটি করা যাবে না।

২. মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা।

৩. মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পূরণ করা।

অর্থাৎ তার রেখে যাওয়া সম্পদ দিয়ে প্রথমে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ হতে ঋণ পরিশোধ (যদি থাকে) করা। এরপর অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তার বৈধ অসিয়ত পূরণ করা। অসিয়ত পূরণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশের বেশি ব্যয় করা যাবে না।

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ১৭৬।

এই কাজগুলো করার পর মৃতের অবশিষ্ট সম্পত্তি মহান আল্লাহ্ নির্দেশিত নির্দিষ্ট অংশ অনুপাতে বণ্টন করতে হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১১-১৪ এবং ১৭৬ নং আয়াতে যে সব ওয়ারিসদের বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলেন– ৪ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী।

৪ জন পুরুষ হলো– ১. পিতা, ২. দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা, তার পিতা এভাবে ঊর্ধ্বতন পুরুষ দাদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৩. বৈপিত্রেয় ভাই (মাতা একজন, কিন্তু পিতা ভিন্ন) এবং ৪. স্বামী।

আর ৮ জন নারী হলো– ১. স্ত্রী, ২. কন্যা, ৩. পুত্রের কন্যা, ৪. সহোদরা বোন, ৫. বৈমাত্রেয় বোন (পিতা একজন, কিন্তু মা ভিন্ন), ৬. বৈপিত্রেয় বোন (মাতা একজন, কিন্তু পিতা ভিন্ন), ৭. মাতা ও ৮. দাদি-নানি। দাদির মাতা, নানির মাতা-এ ধারায় ঊর্ধ্বক্রমে সকলেই দাদি-নানির মধ্যে গণ্য হবেন।

পবিত্র কোরআনে সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ছয়টি অংশের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো হলো– অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ এবং এক-ষষ্ঠাংশ।

ওয়ারিস মূলত তিন প্রকার। যথা– ১. যাবিল ফুরুয, ২. আসাবাহ এবং ৩. যাবিল আরহাম–

১. যাবিল ফুরুয হলো– যে ৮ জন নারী ও ৪ জন পুরুষের প্রাপ্য অংশের কথা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে তারা।
২. আসাবাহ হলো– যাবিল ফুরুয-এর অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট সম্পদ যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।
৩. যাবিল আরহাম হলো– মৃতের এমন আত্মীয় যারা যাবিল ফুরুয এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

উপরে বর্ণিত ৪ জন পুরুষ ওয়ারিসের মধ্যে ২ জন কখনো সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয় না। তারা হলো– পিতা ও স্বামী। অপর দু'জন অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো বঞ্চিত হয়। আর ৮ জন মহিলা ওয়ারিসের মধ্যে মাতা, স্ত্রী, কন্যা এ

তিনজন কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হয় না। বাকিরা অবস্থার প্রেক্ষিতে বঞ্চিত হতে পারে। [আরও বিস্তারিত জানার জন্য 'ইলমুল ফারাইয'-এর কিতাবসমূহ দেখার অনুরোধ রইল]

সুতরাং ইসলামি শরিয়ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যেও নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছে। সে মাতা হোক, স্ত্রী হোক কিংবা কন্যা হোক অবশ্যই সম্পত্তির অংশিদার হবে। আর যদি বোন, বৈমাত্রের বোন, বৈপিত্রেয় বোন, পুত্রের কন্যা কিংবা দাদি-নানিও হয় তবে সম্পদের অংশীদার হবে কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা বঞ্চিতও হতে পারে। নিচে মহিলাদের অংশ ও অবস্থাগুলো আরো স্পষ্ট করা হলো–

স্ত্রীর মিরাস

স্ত্রী তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে অংশ পাবে। স্ত্রীর দুটি অবস্থা–

১. মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে স্ত্রী তার (স্বামীর) রেখে যাওয়া সম্পত্তির চারভাগের একভাগ সম্পত্তি পাবে।

২. আর সন্তান থাকলে আট ভাগের একভাগ পাবে।

কন্যার মিরাস

কন্যা তার পিতার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। তার তিনটি অবস্থা–

১. কন্যা যদি একজন হয় এবং মৃতের কোন পুত্র সন্তান না থাকে তবে, ঐ একজন কন্যা মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২. কন্যা যদি একাধিক হয় এবং মৃতের কোন পুত্র সন্তান না থাকে, তবে ঐ কন্যাগণ সকলে একসাথে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. আর যদি কন্যার সাথে পুত্র থাকে তবে কোরআনে বর্ণিত 'এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান' নীতিতে সম্পত্তি বণ্টন হবে।

পুত্রের কন্যার মিরাস

মৃতের সম্পত্তিতে পুত্রের কন্যাদেরও তথা পৌত্রীদেরও অংশ রয়েছে। তাদের ৬টি অবস্থা–

১. যদি মৃতের পুত্র-কন্যা না থাকে, কেবল একজন পৌত্রী থাকে তখন ঐ পৌত্রী মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২. যদি মৃতের পুত্র-কন্যা না থাকে, কিন্তু একাধিক পৌত্রী থাকে তখন ঐ একাধিক পৌত্রীর সবাই মিলে মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. যদি মৃতের পুত্র-কন্যা না থাকে, কিন্তু একজন পৌত্র এবং এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে তখন ঐ এক পৌত্রের কারণে বাকি পৌত্র বা পৌত্রীগণ 'আসাবা' হয়ে যাবে। এ অবস্থায় 'যাবিল ফুরূয'দের অংশ বণ্টনের পরে তারা বাকি সম্পত্তি পৌত্র-পৌত্রীদের মধ্যে 'এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান' নীতিতে বণ্টন করা হবে।

৪. মৃত ব্যক্তির যদি এক কন্যা থাকে (পুত্র/প্রপৌত্র না থাকে) এবং তার সাথে একাধিক পৌত্রী থাকে, তবে পৌত্রীর অংশ এক-ষষ্ঠাংশ। একজন হোক বা একাধিক হোক তাদের অংশ এক-ষষ্ঠাংশই হবে।

৫. মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক কন্যা সন্তান থাকে তবে পৌত্রী বঞ্চিত হবে। এ অবস্থায় যদি পৌত্রীর সাথে পৌত্র থাকে তবে তারা 'আসাবা' হিসেবে মিরাস পাবে।

৬. মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকলে পৌত্রী বঞ্চিত হবে।

বোনের মিরাস

মৃতের সম্পত্তির মধ্যে সহোদর বা আপন বোনও অংশ পাবে। বোনের ৪ অবস্থা–

১. মৃতের বোন একজন হলে এবং তার পুত্র-কন্যা না থাকলে, ঐ বোন তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২. মৃতের সহোদর বোন যদি একাধিক হয় এবং তার পুত্র-কন্যা না থাকে, তবে ঐ একাধিক বোন সবাই মিলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. সহোদর বোনের সাথে যদি সহোদর ভাই থাকে, তবে ভাইয়ের কারণে বোন 'আসাবা' বা অবশিষ্টভোগী হয়ে যাবে এবং সহোদর ভাই-বোনরা 'এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান' নীতিতে সম্পত্তির অংশীদার হবে।

৪. যদি মৃতের কন্যা বা পৌত্রীর সাথে সহোদর বোন থাকে তবে সহোদর বোন 'আসাবা' হয়ে যাবে এবং 'যাবিল ফুরূয'দের সম্পত্তি বণ্টনের পর অবশিষ্ট অংশ সহোদর বোন পাবে।

বৈমাত্রেয় বোন

মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোনও ইসলামি শরিয়তের বিধান মোতাবেক মিরাস পাবে। তার ৭ অবস্থা–

১. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে এবং সহোদর বোন না থাকলে ঐ বৈমাত্রেয় বোন 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন একাধিক হলে এবং সহোদর বোন না থাকলে ঐ বৈমাত্রেয় বোনগণ 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র আপন বোন থাকলে এবং তার সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকলে তবে এ অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন এক-ষষ্ঠাংশ পাবে (মেয়েদের সর্বোচ্চ মিরাস দুই-তৃতীয়ংশ পূরণের জন্য)।

৪. মৃত ব্যক্তির দুই জন সহোদর বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন মিরাস পাবে না।

৫. মৃত ব্যক্তির যদি দুই জন সহোদর বোন থাকে সাথে বৈমাত্রেয় বোন ও ভাই থাকে তবে এই অবস্থায় বৈমাত্রেয় ভাই-বোন আসাবা হয়ে যাবে এবং 'যাবিল ফুরূয'দের অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট সম্পদের 'এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান' নীতিতে সম্পত্তির অংশীদার হবে।

৬. যদি মৃতের কন্যা বা পৌত্রীর সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকে তবে বৈমাত্রেয় বোন 'আসাবা' হয়ে যাবে এবং 'যাবিল ফুরূয'দের সম্পদ বণ্টনের পর অবশিষ্ট অংশ বৈমাত্রেয় বোন পাবে।

৭. মৃতের পুত্র, পৌত্র (এভাবে যত নিচের দিকে হোক), পিতা, পিতামহ, আপন ভাই, দু'জন আপন বোন অথবা একজন আপন বোন সেই সঙ্গে কন্যা বা পৌত্রী জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হবে।

বৈপিত্রেয় বোনের মিরাস

বৈপিত্রেয় বোনও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হয়। তার ৩ অবস্থা–

১. মৃত ব্যক্তির যদি একজন বৈপিত্রেয় বোন থাকে, তবে সে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।

২. দুই অথবা ততোধিক বৈপিত্রেয় বোন থাকলে তাদের অংশ এক-তৃতীয়াংশ। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সমান অংশ পাবে। তাদের বেলায় নারী-পুরুষের তারতম্য হয় না। সুতরাং পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাওয়ার নিয়ম বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

৩. মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা অথবা পৌত্র, পৌত্রী (যত নিচের দিকে হোক), পিতা, দাদা– এদের কারও বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন মিরাস পাবে না।

মাতার মিরাস

মৃত ব্যক্তির মাতাও তার ওয়ারিস হবে। মাতার ৩ অবস্থা–

১. মৃতের মাতার সাথে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি (যত নিচে হোক) কেউ জীবিত থাকলে মা তার সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক ভাই-বোন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন অথবা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন অথবা একাধিক প্রকারের মিশ্রিত ভাই-বোন যাই হোক না কেন, এ অবস্থায় মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।

২. উপরে বর্ণিত আত্মীয়দের অবর্তমানে মাতা তার মৃত সন্তানের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. যদি মৃত ব্যক্তির স্বামী ও মাতা-পিতা থাকে বা স্ত্রী ও মাতা-পিতা থাকে তবে উভয় অবস্থায় মাতা স্বামী-স্ত্রীকে 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে। এটা হযরত উমর (রাদ্বি.)-এর মত এবং এর উপর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেন।

কিন্তু উক্ত দুই অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পিতার স্থলে যদি দাদা জীবিত থাকে অর্থাৎ স্ত্রী, দাদা ও মাতা বা স্বামী, দাদা ও মাতা থাকে তবে মাতা অবশিষ্ট নয় বরং সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে। এটা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ (র.)-এর মত। এর কারণ হলো, পিতা জীবিত থাকলে স্বামী-স্ত্রীকে 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ মাতাকে দিলে মাতার অংশ পিতার অংশের চেয়ে বেশি হবে না। কিন্তু পিতার স্থানে দাদা হলে, যেহেতু দাদা মাতার সম স্তরের ওয়ারিস নন, সেহেতু উক্ত মূলনীতি এখানে কার্যকর হবে না। হযরত যায়েদ ইবন সাবিত (রাদ্বি.)-এর মত এটাই।

দাদি-নানির মিরাস

আরবিতে 'জাদ্‌দাতুন' দ্বারা দাদি– পিতার মা, পিতামহের মা, পিতামহীর মা, প্রপিতামহের মা, প্রপিতামহীর মা এভাবে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বুঝায়। আবার নানি– মায়ের মা, নানির মা, নানির নানির মা এভাবে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বুঝায়। এদের মধ্যে পিতার মা এবং মাতার মা প্রথম স্তরের দাদি-নানি। দ্বিতীয় স্তরের দাদি-নানি হলো দাদার মা, দাদির মা ও নানির মা। প্রথম স্তর বর্তমান থাকলে ঊর্ধ্বতন স্তরের দাদি-নানি বঞ্চিত হয়। পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীর সম্পত্তিতে দাদি-নানির মিরাস আছে। হাদিস শরিফের বর্ণনায় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মায়ের অবর্তমানে দাদি-নানিকে মিরাস প্রদান করেছেন বলে জানা যায়। তাই এই ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। তারা 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে মিরাস পাবে আবার অবস্থা ভেদে বঞ্চিত হবে। তাদের ৩ অবস্থা–

১. মৃতের পিতা, মাতা, দাদা (যত ঊর্ধ্বে হোক) জীবিত না থাকলে দাদি ও নানি এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবন মাজাহ প্রমুখ উদ্ধৃত করেন যে, একবার হযরত আবু বকর (রাদ্বি.)-এর নিকট এক 'নানি' মিরাসের দাবি নিয়ে আসলে তিনি তাকে বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে আপনার কোন অংশ নেই এবং আল্লাহ্‌র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকেও আমি এই মর্মে কিছু জানতে পারিনি। আপনি চলে যান, আমি এ ব্যাপারে পরামর্শ করব। তিনি সাহাবায়ে কেরাম-এর সাথে পরামর্শ করলে হযরত মুগিরা ইবন শু'বা (রাদ্বি.) বলেন, একবার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক 'নানি' উপস্থিত হলে তিনি তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন। তখন হযরত আবু বকর (রাদ্বি.) এ বিষয়ে সাক্ষী চাইলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ (রাদ্বি.) হযরত মুগিরা (রাদ্বি.)-কে সমর্থন দেন। তখন হযরত আবু বকর (রাদ্বি.) ঐ 'নানি'কে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করেন। অতঃপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বি.)-এর খিলাফতকালে এক মৃতের 'দাদি' এসে হযরত উমর (রাদ্বি.)-এর কাছে মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেন, আপনার মিরাস সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবে কিছু নেই। প্রথমে প্রদত্ত

[হযরত আবু বকর (রাদ্বি.)-এর সময়কার] নির্দেশ নানির ব্যাপারে ছিল। আর আমার নিজের পক্ষ হতে মিরাসের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা সম্ভব নয়। সুতরাং আপনিও এক-ষষ্ঠাংশের বেশি পাবেন না। যদি আপনারা দাদি-নানি উভয়ে জীবিত থাকেন তাহলেও তা ঐ এক-ষষ্ঠাংশ আপনাদের মধ্যে ভাগ করা হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে কোন একজন জীবিত থাকেন তবে তিনি তা একাই পাবেন।[১]

২. মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকলে দাদি বঞ্চিত হয়। অবশ্য নানির এক-ষষ্ঠাংশ বহাল থাকবে। কারণ দাদির মিরাস যেহেতু পিতার মধ্যস্থতায় হয়, আর নিয়মানুযায়ী মধ্যস্থতাকারীর বর্তমানে মধ্যস্থতা লাভকারী বঞ্চিত হয়, তাই পিতার বর্তমানে দাদি বঞ্চিত হয়। দাদার দ্বারা তার ঊর্ধ্বতন দাদাগণ বঞ্চিত হয়। তবে মৃতের দাদি দাদা দ্বারা বঞ্চিত হয় না। কারণ দাদির সাথে মধ্যস্থতাকারী দাদা নন বরং পিতা। সুতরাং দাদা জীবিত থাকলে দাদি মিরাস লাভ করবে।

৩. মৃত ব্যক্তির মা জীবিত থাকলে দাদি ও নানি কোন অংশ পাবে না। কারণ রাসুল (দ.) দাদি-নানিকে মিরাস প্রদান করেছেন মা না থাকার কারণে।[২]

এই আলোচনায় এটাই স্পষ্ট যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে মহিলাদের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, পরিপূর্ণ, যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক। কারও মনে এমন প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, ‘এক

১. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : ফারাইয, পরিচ্ছেদ : দাদির অংশ, হাদিস নং : ২৮৯৪; সুনানে তিরমিযী; সুনানে ইবন মাজাহ; মিশকাতুল মাসাবিহ।

২. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : ফারাইয, পরিচ্ছেদ : দাদির অংশ, হাদিস নং : ২৮৯৫।

ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান"[১] নীতির মাধ্যমে কি ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পদ দিচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো– কতিপয় যৌক্তিক কারণে এই নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলো হলো–

১. একজন পুরুষের উপর যে ধরনের আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত, একজন নারীর উপর সে ধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে না। কেননা নারীর ব্যয়ভার বহন করা তার পিতা, স্বামী, ভাই, ছেলে, অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়ের উপর বা রাষ্ট্রের উপর কর্তব্য। পুরুষ নারীকে দেনমোহর, বাসস্থান, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি প্রদান করতে বাধ্য। মহান আল্লাহ্‌র বাণী– "পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক, কারণ আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তা এ জন্য যে, পুরুষ তাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে"।[২]

২. স্ত্রীর সার্বিক দায়িত্ব পূরণের সাথে সাথে স্বামী তার সন্তান-সন্ততি এবং সংসারের অন্যান্য সদস্যদের যাবতীয় ব্যয়ও বহন করে। এই ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে নারীরা মুক্ত। সুতরাং একজন পুরুষের ব্যয়ের আবশ্যকতা নারীদের তুলনায় অধিক এবং ব্যাপক। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী– "আর পিতার উপর কর্তব্য যথারীতি তাদের (সন্তান-সন্ততির) ভরণ-পোষণ করা"।[৩]

৩. স্ত্রী বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর লাভ করে থাকে। আর দেনমোহর আদায় করা স্বামীর উপর ফরয। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তাদের দেন-মোহর খুশি মনে দিয়ে দাও। আর যদি তারা খুশি হয়ে তা হতে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারো"।[৪]

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ১১।
২. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৩৪।
৩. আল্ কোরআন, সূরা বাক্বারা : ২৩৩।
৪. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৪।

৪. আয়-রোজগারের দায়িত্বও পুরুষকে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে নারীর কোন দায়িত্ব নেই। তাই যৌক্তিকভাবে পুরুষের সম্পত্তির আবশ্যকতা বেশি।

৫. বিয়ের পূর্বে নারী থাকে তার পিতা বা ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। বিয়ের পর থাকে স্বামীর এবং স্বামী মারা গেলে থাকে পুত্রের তত্ত্বাবধানে। আর কেউ না থাকলে নারী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকবে। সুতরাং তার সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। তাই মিরাস পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীকে কম দেওয়ার কথা বলা অবান্তর।

সুতরাং বাহ্যিকভাবে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে নারীর চেয়ে পুরুষের অংশ বেশি মনে হলেও যেহেতু নারীর খরচ করার বিশেষ কোন খাত নেই সেহেতু মূলত নারীই বেশি পেয়ে থাকে।

কর্মের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ-সম্পদ ও নারী

নারী তার নিজ যোগ্যতায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং উপার্জিত সম্পদের মালিক সেই হবে। তবে স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খরচ করবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌উদ (রাদ্বি.)-এর স্ত্রী হযরত যয়নাব (রাদ্বি.)-এর হাদিসটিসহ এ বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিয়ের দেন-মোহর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ ও নারী

সামাজিক বন্ধন ও বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম স্ত্রীলোকের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বিয়ের ক্ষেত্রে দেন-মোহর নারীর একটি অধিকার। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৪ নং আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের তাদের দেন-মোহর খুশি মনে দিয়ে দিতে হবে। বিধবা মহিলা এবং কুমারী (বালিকা) হতে বিয়ের জন্য অনুমতি নিতে হবে। হাদিস শরিফে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রাদ্বি.) বর্ণিত হাদিস যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কোন বিধবা মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া এবং কোন কুমারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।

তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তার অনুমতি কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, চুপ থাকা"।[১] এখানে আমরা শুধু দেন-মোহর নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। কারণ দেন-মোহর মহিলাদের সম্পদ লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম।

বিয়ের দেন-মোহরের মাধ্যমেও নারী অর্থ-সম্পদ লাভ করে থাকে এবং এই সম্পদের মালিক সে নিজেই হয়। আবার দেন-মোহর আদায় করাও স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক। কাজেই দেন-মোহরের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে নারী এক বিশাল অংকের সম্পদের মালিক হয়। এতে অন্য কেউ অংশীদার বা দাবিদার হয় না। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তাদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করবে তাদের নির্ধারিত দেন-মোহর ফরয হিসেবে প্রদান করবে"।[২] "তাদের (স্ত্রী) একজনকে যদি অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করবে না"।[৩]

---

১. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : বিবাহ, পরিচ্ছেদ : মেয়েদের কাছে বিয়ের অনুমতি চাওয়া, হাদিস নং : ২০৯২।

২. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ২৪।

৩. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ২০।

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা প্রদান করেছ তন্মধ্য থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়"।[১] "আর যদি তারা খুশি হয়ে তা হতে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারো"।[২]

হযরত উকবাহ ইবন আমির (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে– তা হচ্ছে সে শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান বৈধ করে নিয়েছো"।[৩] সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বি.) ফায়সালা দিয়েছেন যে, "কোন মহিলাকে কোন পুরুষ বিয়ে করলে এবং বিয়ের পর (স্বামী-স্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর) খালাওয়াতে সহিহা বা একসাথে কোন কক্ষে অবস্থান করলে, তবে স্বামীর উপর মোহর ওয়াজিব হবে"।[৪] হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট দেন-মোহর ধার্য পূর্বক কোন নারীকে বিয়ে করে, কিন্তু তার মনে স্ত্রীর অধিকার আদায় করে দেওয়ার ইচ্ছে নেই, এভাবে ধোঁকা দিয়ে তাকে বিবাহ করে তার অধিকার তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করে তবে সে কেয়ামতের দিন একজন ব্যভিচারী হিসেবে উপস্থিত হবে।[৫] এই হাদিসটি মাজমাউয যাওয়াইদ, মাম্বাউল ফাওয়াইদ ও ফিকহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থেও উল্লেখ আছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষের উপর তার স্ত্রীর দেন-মোহর আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। আর এর মাধ্যমে নারী বেশকিছু অর্থ-সম্পদের মালিক হয়, যা তার একান্ত নিজের।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই দেন-মোহরের পরিমাণ কত হবে? এর উত্তর হলো– ইসলামি শরিয়ত এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেনি। এর কারণ– পাত্র-পাত্রী ধনীও হতে পারে আবার গরীবও হতে পারে। আবার প্রত্যেকের নিজস্ব কৃষ্টি-আদত-অভ্যাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি থাকতে পারে।

---

১. আল্ কোরআন, সূরা বাক্বারা : ২২৯।

২. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ৪।

৩. সহিহ্ মুসলিম, অধ্যায় : বিবাহ, পরিচ্ছেদ : বিবাহের শর্তাবলি পূর্ণকরণ, হাদিস নং : ৩৩৬৩ (৩৩৩৭ ই.ফা.); সহিহ্ বুখারি।

৪. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, অধ্যায় : বিবাহ, পরিচ্ছেদ : পর্দা টাঙানো, হাদিস নং : ১০৯৪।

৫. মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, ফিক্হুস সুনানি ওয়াল আসার, ২য় খণ্ড, অনুবাদঃ ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ই.ফা, ঢাকা, ২০১০, পৃ.৫৮, হাদিস নং : ১৫৫৪।

তাই দেন-মোহরের নির্দিষ্ট সীমা ঠিক না করে তা প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থার উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ সাধ্য ও ক্ষমতার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে স্থায়ী মূল্য আছে এমন কিছুই মোহর হিসেবে দেওয়া উচিত। তা কম হোক বা বেশি, যদি তাতে উভয় পক্ষ রাজি থাকে। এমন কি পবিত্র 'কোরআন শিক্ষা দেওয়া'ও মোহর হতে পারে। হযরত আমের বিন রবিয়া হতে বর্ণিত, বনু ফাযারার জনৈক মহিলা এক জোড়া জুতাকে মোহর হিসেবে গ্রহণ করে বিয়ে করে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি এক জোড়া জুতার বিনিময়ে নিজেকে সমর্পণ করতে সম্মত হয়েছ? সে বলল, হ্যাঁ। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলেন।[১]

হযরত সাহল বিন সা'দ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত, একজন সাহাবি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত জনৈক মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সাহাবিকে বললেন– তাকে মোহর দেওয়ার মতো কিছু তোমার কাছে আছে কি? সে বলল, আমার কাছে আমার এই লুঙ্গি ছাড়া আর কিছু নেই। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি যদি তোমার লুঙ্গি তাকে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি তো বস্ত্রহীন হয়ে যাবে। কাজেই অন্য কিছু যোগাড় করে নিয়ে এসো। সে বলল, আমি আর কিছু পাচ্ছি না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, খুঁজে দেখ, এমনকি লোহার একটা আংটিও যদি পাও। অতঃপর সে খুঁজে দেখলো। কিন্তু কিছুই পেল না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

তোমার কাছে কি কোরআনের কিছু জানা আছে? সে বলল, জি, অমুক সূরা। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঠিক আছে। তোমার যেটুকু কোরআন জানা আছে তার (সেটুকু শিক্ষা দানের) বিনিময়ে তোমাদের দু'জনের বিয়ে সম্পাদন করলাম।[২]

---

১. জামে আত তিরমিযি, অধ্যায় : বিবাহ, পরিচ্ছেদ : মহিলাদের মোহরের বর্ণনা, হাদিস নং : ১১১৩; সুনানে ইবন মাজাহ; মুসনাদে আহমদ।
২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : বিবাহ, পরিচ্ছেদ : কোরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে মোহর ব্যতীত বিবাহ প্রদান, হাদিস নং : ৫১৪৯ (৪৭৭২ ই.ফা); সহিহ্ মুসলিম।

হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশটি আয়াত স্থির করলেন। হযরত আনাস (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, আবু তালহা হযরত উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আপনার মতো লোককে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কিন্তু আপনি কাফের আমি মুসলমান। আপনাকে বিয়ে করা আমার জন্য বৈধ নয়। তবে আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে সেটাই আমার মোহর। এছাড়া আমি আপনার কাছে আর কিছু চাই না। অতঃপর ওটাই তার মোহর হলো।[১]

এ থেকে বুঝা যায় যে, কোন সামান্য জিনিসকে, এমনকি কোন সেবা মূলক কাজকেও মোহর হিসেবে ধার্য করা যায়। যেমন পবিত্র কোরআন শিখানো একটা সেবামূলক কাজ। বস্তুত মোহর স্ত্রীর উপকারের জন্যই তার প্রাপ্য হিসেবে ধার্য হয়েছে। তাই আবু তালহা (রাদ্বি.) ইসলাম গ্রহণ করলে তার দ্বারা যে উপকার পাওয়া যাবে তাকেই উম্মে সুলাইম (রাদ্বি.) মোহর হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর সাথে বিবাহে সম্মত হন। তবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে দশ দিরহাম এবং ইমাম মালেকের মতে, তিন দিরহামের কম হলে মোহর আদায় হবে না। আর বেশির কোন সীমা নেই। বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাদ্বি.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে চারশো দিরহামের চেয়ে বেশি মোহর ধার্য করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামা মাত্র জনৈক কুরাইশী মহিলা তার কাছে আসেন এবং প্রতিবাদ করে বলেন, আপনি কি কোরআনের এ আয়াত পড়েননি,

"যদি তোমরা তোমাদের কোনো স্ত্রীকে বিপুল পরিমাণ সম্পদও দিয়ে থাকো, তবে তার কোন অংশ ফেরত নিও না"।[২] হযরত উমর (রাদ্বি.) তৎক্ষণাৎ বললেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো। একজন ছেলে ভুল করলো এবং একজন মেয়ে সঠিক কথা বললো"।

---

১. সাইয়্যেদ সাবেক, ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্, ২য় খণ্ড, অনুবাদ : আকরাম ফারুক ও আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৩৫, ১৩৬।
২. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ২০।

এরপর তিনি মসজিদে ফিরে গেলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে চারশো দিরহামের চেয়ে বেশি মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। এখন বলছি যে, কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তি থেকে যতো খুশি দিতে পারে। (সাঈদ বিন মনসুর, আবু ইয়ালী)[১] উল্লেখ্য, মোহর যেহেতু স্ত্রীর হক সেহেতু নারী নিজেই তা নির্ধারণ করার অধিকার রাখে।

ইসলাম ধর্মে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সাথে সাথে নারীর অধিকারের বিষয়েও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যাতে সবাই হালাল উপায়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে যাতে বিয়ে করা সহজ হয়, সে জন্য ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত মোহর নির্ধারণকে অপছন্দ করেছে। হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে বিয়েতে যতো কম ব্যয় সে বিয়ে ততোই বরকতময়।" তিনি আরো বলেন, "নারীর সৌভাগ্য তার মোহর কম হওয়া, বিয়ে সহজ হওয়া এবং চরিত্র মাধুর্যে নিহিত। আর তার দুর্ভাগ্য তার মোহরের পরিমাণ বৃদ্ধিতে, বিয়ের জটিলতায় ও চরিত্রের কদর্যতায়।"[৩]

তাই লোক দেখানোর জন্য 'অধিক দেন-মোহর' ধার্য করাতে কোন কল্যাণ নেই। তবে একথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক স্বামীরই কর্তব্য তার আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেন-মোহর আদায় করে দেওয়া। আর মেয়ে পক্ষও তাতে সহজেই রাজি হলে পবিত্র বন্ধন বিয়ে এতে সহজ হবে। বিয়ে সহজ হলে নৈতিকতা ও চারিত্রিক মাধুর্যপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

---

১. সাইয়্যেদ সাবেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

অসিয়ত মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পত্তি ও নারী

পিতা চাইলে তার কন্যার জন্য বা স্বামী চাইলে স্ত্রীর জন্য সম্পদ অসিয়ত করতে পারেন। আর অসিয়ত অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়। তবে তা অবশ্যই তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে না এবং এতে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি থাকতে হবে। মুসলিম আইনে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণ যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই মৃতের সম্পত্তির ওয়ারিস হবে তাই তাদের প্রতি অসিয়ত করা যায় না। আর যদি করতেই হয় তবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি থাকতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী– "মৃত ব্যক্তির অসিয়তের দাবি পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর"।[১] হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে আসেন। সে সময় আমি মক্কায় ছিলাম। কোন ব্যক্তি যে স্থান থেকে হিজরত করে সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি বলতেন, আল্লাহ্ রহম করুন ইবনু আফরা-এর উপর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি কি আমার সমুদয় মালের ব্যবহারের অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, (হ্যাঁ) এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিসগণকে দরিদ্র কিংবা পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাবার চেয়ে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। তুমি যখনই কোন খরচ করবে, তা সাদাকারূপে গণ্য হবে। এমনকি সে লোকমাও যা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে। হয়ত আল্লাহ্ তায়ালা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং লোকেরা তোমার দ্বারা উপকৃত হবেন, আবার কিছু ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত কেউ ছিল না"।[২]

---

১. আল্ কোরআন, সূরা নিসা : ১১-১৪।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : অসিয়ত, পরিচ্ছেদ : ওয়ারিশদেরকে অন্যের দ্বারস্থ অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম, হাদিস নং : ২৭৪২।

হিবার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ ও নারী

'হিবা' আরবি শব্দ যার অর্থ দান, বখ্শিশ, অনুদান ইত্যাদি। কোন লাভ বা মুনাফা ছাড়া কাউকে কিছু দান করে দেওয়াকে হিবা বলা হয়। হিবা শব্দটি একটি বিশেষ পরিভাষা। ফিক্হ-এর পরিভাষায় এক ব্যক্তি কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে এবং কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ না করে স্বীয় কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা অন্য কাউকে একেবারে অর্পণ করাকে হিবা বলে।

কোন সম্পদ হিবা করতে হলে তা অবশ্যই– ১. দাতার বৈধ মালিকানাধীন হতে হবে, ২. তা বিদ্যমান থাকতে হবে, ৩. তা জানা থাকতে হবে, ৪. (হিবা করা বস্তু বা সম্পদ) হিবা না করা বস্তু বা সম্পত্তি হতে পৃথক হবে, ৫. একাধিক মালিক থাকলে তবে প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট হতে হবে, ৬. দাতার দখলে থাকতে হবে, ৭. আর্থিক মূল্য থাকতে হবে, ৮. শরিয়তের দৃষ্টিতে তা ক্রয়-বিক্রয় ও বহন করার বিধিনিষেধ থাকবে না, ৯. মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে এবং ১০. কোন লেনদেনের কাজে নিয়োজিত থাকবে না।

যিনি হিবা করবেন তাকে অবশ্যই– ১. বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে, ২. প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে, ৩. স্বাধীন হতে হবে, ৪. সম্পদের মালিক হতে হবে, ৫. নিজের সমগ্র সম্পত্তির পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হবেন না, ৬. নেশাগ্রস্ত হবেন না, ৭. মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হবেন না এবং ৮. এমন বিবাহিত স্ত্রী হবেন না যার হিবা স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকে। তবে– ১. মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি, ২. ঝড়ের কবলে পতিত নৌযানের আরোহী, ৩. মহামারীগ্রস্ত শহরের অধিবাসী, ৪. মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি এবং বিজয়ী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের হিবা এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকর হবে।[১]

হিবার রুকনগুলো হলো– ১. ইজাব বা প্রস্তাব করা, ২. কবুল বা গ্রহণ করা এবং ৩. দখল হস্তান্তর করা।

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খণ্ড, ই.ফা. ১৯৯৬, পৃ. ৬৬২।

পিতা-মাতা যদি মনে করেন যে তাঁর কোন সন্তানকে কিছু হিবা করবেন তবে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করে তা করতে পারবেন। কারণ রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্তানদের মধ্যে জুলুম করতে নিষেধ করেছেন। হযরত নুমান ইবন বাশীর (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার এ পুত্রকে আমার নিজস্ব একটি গোলাম (ক্রীতদাস) দান করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই তার মতো একটি করে গোলাম দান করেছো? তিনি বললেন, না। তখন নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে ওটা তুমি ফেরত নাও"।[১]

কোন এক সন্তানকে দান করে অন্য সন্তানকে না দেয়া অথবা কাউকে বেশি দেয়া মাকরূহ্, হারাম নয়। কারণ এখানে যদিও ফেরত নেওয়ার কথা আছে কিন্তু অন্য এক হাদিসে বলেছেন, "এটা অন্যায় কাজ তাই আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী করে নাও"।[২] যদি হারাম হতো এ অনুমতি প্রদান করতেন না। সুতরাং বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়। অবশ্য এর জন্য শর্ত হলো, অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে এটা করা যাবে না। এই ধরনের হিবাকে 'হিবা তাফদীলী' বলে।[৩]

সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, হিবার মাধ্যমে পিতা-মাতা তাঁর কন্যা সন্তানের জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সম্পত্তি দান করতে পারেন। এই সম্পদের মালিক সেই কন্যা সন্তানই হবে।

১.সহিহ্ মুসলিম, অধ্যায় : দান, পরিচ্ছেদ : দানে সন্তানদের মধ্যে কাউকে প্রাধান্য দেয়া মাকরুহ, হাদিস নং : ৪০৬৯ (ই.ফা. : ৪০৩২)।

২. সহিহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, বা.ই.সে., ঢাকা, পৃ. ৩৯৯।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খণ্ড, ই.ফা., পৃ. ৬৬৩।

হাদিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ ও নারী

হাদিয়া আরবি শব্দ, যার অর্থ উপঢৌকন, উপহার। পরিভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে এবং কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ না করে স্বীয় কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা অন্য কাউকে খুশি করার উদ্দেশ্যে একেবারে অর্পণ করাকে হাদিয়া বলে। অর্থাৎ কাউকে আন্তরিকতা ও ভক্তি সহকারে কোন কিছু উপহার দেওয়াকে হাদিয়া বলে।

হাদিস শরিফে হাদিয়া প্রদানের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা একজন অন্যজনকে উপহার দাও। উপহার মনের ময়লা দূর করে। এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে বকরীর পায়ের এক টুকরা ক্ষুর হলেও তা উপহার দিতে যেন অবহেলা না করে"।[১] অনুরূপ হাদিস সহিহ্ বুখারিতেও এসেছে।[২] সুতরাং হাদিয়া প্রদান করা সুন্নত। কোন মহিলাকে যদি তার কোন নিকট আত্মীয় কোন সম্পত্তি হাদিয়া হিসেবে দেয় তবে তা সে গ্রহণ করতে পারবে। এটা তার নিজের সম্পদ হিসেবেই গণ্য হবে।

---

১. জামে আত তিরমিজি, অধ্যায় : ওয়ালাআ ও হিবা, পরিচ্ছেদ : উপঢৌকন আদান-প্রদানে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উৎসাহ প্রদান, হাদিস নং : ২১৩০; মিশকাতুল মাসাবিহ।
২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : হিবা, এর ফযিলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান, পরিচ্ছেদ- হিবা ও এর ফযিলত, হাদিস নং : ২৫৬৬।

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে নারীর অধিকার

ইসলাম নারী-পুরুষ সবাইকে সমভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)-কে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে এসেছে, "আর তিনি (আল্লাহ্) আদম (আ.)-কে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন (অর্থাৎ সকল বিষয়ে জ্ঞান দান করলেন)। এরপর ফেরেশতাদের সামনে এক এক করে সবকিছু উপস্থাপন করে বললেন, তোমরা এগুলোর নাম বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি মহা পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না। আপনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী"।[১] মহান আল্লাহ্ থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করে হযরত আদম (আ.) সমস্ত ফেরেশ্তা এবং সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের আদেশ দিয়ে পবিত্র কোরআনের বাণী– "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আপনার প্রভু মহান। যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না"।[২] "(আপনি বলুন) হে পরওয়ারদেগার, আপনি (মেহেরবানী করে) আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন"।[৩] আর পবিত্র কোরআনের এই সকল আয়াত দ্বারা সকল বান্দা তথা নর-নারী উভয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয সাব্যস্ত হয়। সুতরাং নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন জরুরী। তাই পুরুষের মত নারীদের রয়েছে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সমান অধিকার। পবিত্র হাদিসের বাণী, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয"। এছাড়াও রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য পথ অবলম্বন করে,

---

১. আল্ কোরআন, সূরা বাক্বারা : ৩১-৩২।
২. আল্ কোরআন, সূরা আলাক্ব : ১-৫।
৩. আল্ কোরআন, সূরা ত্বাহা : ১১৪।

মহান আল্লাহ্ তদ্বারা তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন"।[১] এছাড়াও হাদিসে এসেছে আল্লাহ্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলা সাহাবিদের নির্দিষ্ট দিনে হাদিস শ্রবণ করতে নির্দেশ দেন। এছাড়াও তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য তার ঘর থেকে রওনা হয়, তার এই মহৎ উদ্যোগের জন্য তার পায়ের নিচে ফেরেশতাগণ তাদের পাখা বিস্তার করেন"।[২]

আর জ্ঞানী যেই হোক, পুরুষ কিংবা নারী, উভয়ের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এসেছে, "হে রাসুল, আপনি বলে দিন, যারা জানে আর যারা জানে না (অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খ), তারা কি কখনও সমান হতে পারে?"।[৩] অন্য আয়াতে করিমায় এসেছে, "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিকমত বা প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করা হয়, তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়ে থাকে"।[৪] এ ব্যাপারে পবিত্র হাদিসে এসেছে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "মহান আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাঁকে তিনি দ্বীনী ইল্ম দান করেন। আমি তা বিতরণকারী, আল্লাহ্ই দাতা। সর্বদাই এ উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না"।[৫]

একজন কন্যা বা নারীকে যোগ্য ও শিক্ষিত করে গড়ে তুললেও পুরস্কার রয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে– যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে– রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাকত্ব গ্রহণ করে তাকে উত্তমভাবে লালন পালন করলে ঐ কন্যা সে ব্যক্তির জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে"। আর কন্যাদের উত্তম আচরণ-শিষ্টাচার ও লেখা-পড়া শেখানোর চেয়ে উত্তম লালন-পালন আর কিছু নেই। কারণ হাদিস শরিফে

১. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : জ্ঞান, পরিচ্ছেদ : জ্ঞানার্জনের ফযিলত, হাদিস নং : ৩৬৪৩।
২. সুনানে ইবন মাজাহ, অধ্যায় : ভূমিকা, পরিচ্ছেদ : আলিমদের মর্যাদা এবং জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা, হাদিস নং : ২২৬; মুসনাদে আহমদ; দারেমি।
৩. আল্ কোরআন, সূরা যুমার : ৯।
৪. আল্ কোরআন, সূরা বাক্বারা : ২৬৯।
৫. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : জ্ঞান, পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের ইল্ম দান করেন, হাদিস নং : ৭১; সহিহ্ মুসলিম; মুসনাদে আহমদ।

একজন দাসীকে উত্তমরূপে লেখা-পড়া ও শিষ্টাচার শিখিয়ে মুক্ত করে দিয়ে তাকে বিয়ে করলে দুটি প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে, সেখানে নিজ কন্যা বা একজন স্বাধীন মহিলাকে উত্তমরূপে লেখা-পড়া ও শিষ্টাচার শেখালে কেমন প্রতিদান হতে পারে?

কতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে হবে

যে জ্ঞান দ্বারা পার্থিব জীবন সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও শরিয়ত সম্মতভাবে সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং আখেরাত চির শান্তিপূর্ণ, কল্যাণময় হয়– আল্লাহ্ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সেই জ্ঞান অর্জন করা ফরয করে দিয়েছেন। মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য তাই এ ক্ষেত্রে একই বিধান দেওয়া হয়েছে।[১]

রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে নারী শিক্ষা

রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেই পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এসময় যে সকল পদ্ধতিতে নারী শিক্ষার প্রসার করা হয় সেগুলো হলো–

১. রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন জুমআর খুত্বা দিতেন তখন সেখানে নারীদের জন্য একটি অংশ বরাদ্দ রাখতেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, –আমি জুমআর দিনে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খুত্বা স্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম, অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম”।

২. নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদের বিশেষভাবে উপদেশের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। এ মর্মে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে আতা এবং তাঁর থেকে ইবনু জুরায়েজ বর্ণনা করেন, “কোন এক ঈদুল ফিতরের দিনে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত

---

১. আবদুল হালীম আবু শুককাহ, রসূলের (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা, অনুবাদ : মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২য় খণ্ড, বি.আই.আই.টি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪০।

আদায় করে খুত্বা দিলেন, খুত্বা শেষে তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। তখন তিনি হযরত বেলাল (রাদ্বি.)-এর হাতের উপর ভর দিয়েছিলেন আর বেলাল (রাদ্বি.) তাঁর কাপড় মেলে ধরছিলেন, যাতে মহিলারা দান করছিলেন”।[১] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) বর্ণনা করেন, “মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধারণা করলেন যে, তিনি তাঁর বাণী মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। তাই পুনরায় তাদের নসীহত করলেন এবং সাদাকা ও ভাল কাজের আদেশ দিলেন”।[২]

৩. কোন কোন সময় মহিলা সাহাবিগণ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে হাজির হয়ে তাদের সমস্যার কথা বর্ণনা করে সমাধান জেনে নিতেন। হাদিস শরিফে এসেছে, হযরত সুবাইআহ বিনতে হারেস (রাদ্বি.) ছিলেন সাদ ইবনে খাওলা (রাদ্বি.)-এর সহধর্মিণী। সাদ (রাদ্বি.) ছিলেন বনী আমের ইবনে লুয়াই-এর বংশোদ্ভূত এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম। বিদায় হজ্বের সময় তিনি ইন্তিকাল করেন। সাদ ইবনে খাওলার ইন্তিকালের কিছুদিন পরই সুবাইআর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। নিফাসের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তিনি বিয়ের পয়গাম গ্রহণ করার জন্য সাজসজ্জা করে বের হলেন। এমন সময় বনী আবদিদ দার গোত্রের আবুস সানাবেল ইবনে বাকাক তাঁর কাছে এসে বললেন, “ব্যাপার কী? বিয়ের পয়গাম নেবার জন্য যেন সাজসজ্জা করেছেন মনে হচ্ছে। বিয়ের জন্যই নাকি এসব?

---

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : দুই ঈদ, পরিচ্ছেদ : পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারীতে আরোহন করে ঈদের জামাআতে যাওয়া এবং আযান-ইকামত ছাড়া খুতবার পূর্বে সালাত আদায়, হাদিস নং : ৯৬১, এছাড়াও- ৯৭৯, ৯৭৮; সহিহ্ মুসলিম।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : জ্ঞান, পরিচ্ছেদ : আলিম কর্তৃক নারীদের উপদেশ প্রদান করা ও দ্বীনী ইলম শিক্ষা প্রদান, হাদিস নং : ৯৮, এছাড়া- ৮৬৩, ৯৫৯, ৯৬০ ও ৯৬২; সহিহ্ মুসলিম; সুনানে নাসাঈ।

আল্লাহ্‌র কসম, চার মাস দশদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে বৈধ হবে না। হযরত সুবাই'আহ (রাদ্বি.) বলেন, এ কথা শুনে আমি কাপড়-চোপড় গুটিয়ে সন্ধ্যাবেলা রাসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে ইদ্দত শেষ হয়েছে বলে 'ফতওয়া' প্রদান করেন। আর প্রয়োজনবোধে বিয়ে করার অনুমতিও দেন"।[১]

৪. মাঝে মাঝে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলা সাহাবিদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে দিতেন, ওই দিন মহিলা সাহাবিগণ তাঁর কাছ থেকে পবিত্র হাদিস শ্রবণ করতেন এবং দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করতেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত আছে, "মেয়েরা নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, আপনার কাছে সবসময় পুরুষদের ভিড় লেগে থাকে। আপনি আমাদের জন্য আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। ফলে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে তাদের কাছে গেলেন, তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়ে বললেন এবং সৎকাজের আদেশ দিলেন"।[২]

৫. আবার কখনো আল্লাহ্‌র নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিনিধি নিযুক্ত করেও মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। হযরত উম্মে আতিয়া (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত আছে, "রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় আসলে আনসারী মহিলাদের একটি ঘরে একত্রিত করে নসীহত করার জন্য হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে (রাদ্বি.) পাঠালেন। তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরা সালামের

১. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : গর্ভবতী নারীর ইদ্দত, হাদিস নং :২৩০৬; সহিহ্‌ বুখারি; সুনানে নাসাঈ; সহিহ্‌ মুসলিম; মুয়াত্তা।

২. সহিহ্‌ বুখারি, অধ্যায় : জ্ঞান, পরিচ্ছেদ : নারীদের জ্ঞান লাভের জন্য আলাদাভাবে দিন নির্ধারণ করা যায় কি?, হাদিস নং : ১০২; সহিহ্‌ মুসলিম।

জবাব দিলাম। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। এভাবে হযরত উমর (রাদ্বি.)-এর মাধ্যমে জানা গেল যে, দুই ঈদের দিনে যেন আমরা যুবতী, এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও সাথে করে ঈদগাহে নিয়ে যাই। আমাদের জন্য জুমআর নামায ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযায় যেতে নিষেধ করেছেন"।[১]

৬. মহিলাদের নিজ ঘরেই মাহরাম পুরুষদের মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন আল্লাহ্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হযরত মালেক বিন হুয়ারিস (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমরা কয়েকজন যুবক দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যে সময় তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। তখন তিনি বললেন– নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং সেখানেই অবস্থান কর। তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলতে নির্দেশ দাও"।[২]

৭. মৌখিক শিক্ষার পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদের লিখন পদ্ধতি শিক্ষায়ও উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন, নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ্কে (রাদ্বি.) লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তুমি একে (হযরত হাফসা রাদ্বি.) কীট দংশন নিরাময়ের দোয়া শিক্ষা দাও যেমন তাকে লিখতে শিখিয়েছ"।[৩]

---

১. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : সালাত, পরিচ্ছেদ : ঈদের সালাতে নারীর অংশগ্রহণ, হাদিস নং : ১১৩৯।

২. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : খবরে ওয়াহিদ, পরিচ্ছেদ : সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ, আযান, সালাত, সাওম, ফরয ও অন্যান্য আহকামের বিষয়ে অনুমোদনযোগ্য, হাদিস নং : ৭২৪৬ (ই.ফা. : ৬৭৫২)।

৩. সুনানে আবি দাউদ, অধ্যায় : চিকিৎসা, পরিচ্ছেদ : ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে, হাদিস নং : ৩৮৮৭।

৮. অনেক মহিলা সাহাবি নিজেদের গৃহে শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যান্য মহিলাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। যেমন– হযরত আয়েশা (রাদ্বি.)-এর শিক্ষা নিকেতন, এটা মসজিদে নববী সংলগ্ন তাঁর হুজুরা শরিফ কেন্দ্রিক ছিল।[১] হযরত সাফিয়া (রাদ্বি.) ও হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাদ্বি.)-এর কাছেও মহিলাগণ বিভিন্ন বিষয় জেনে নেয়ার জন্য আসতেন বলে বর্ণিত আছে।

৯. মহিলাদের শিক্ষা লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাই মহিলা সাহাবিগণ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। সহিহ্ বুখারির এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) বলেন, "আনসারী মেয়েরা কতই না উত্তম। দ্বীনের বিধি-বিধানে পরিপক্কতা লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি"।

১০. উম্মাহাতুল মু'মিনিন হতে সরাসরি প্রশ্ন করার মাধ্যমে। হযরত সুমামা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রাদ্বি.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে নাবীয (পানিতে খেজুর কিংবা আঙুর গুলিয়ে প্রস্তুত করা এক প্রকারের পানীয়) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমার কাছে বলেন যে, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসল এবং তারা নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'নাবীয' সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি দুব্বা, নাকীর, মুযাফফাত ও হান্‌তাম– এ তাদেরকে নাবীয প্রস্তুত করণে বারণ করলেন।[২] অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) একজন হাবসী দাসীকে ডেকে বললেন, একে জিজ্ঞেস করো। সে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য 'নাবীয' প্রস্তুত করতো'।

---

১. ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান, গবেষণা বিভাগ, ই. ফা., ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৬৪-২৬৫।

২. সহিহ্ মুসলিম, অধ্যায় : পানীয় বস্তু, পরিচ্ছেদ : মুযাফফাত, দুব্বা, হান্‌তাম ও নাকীর–ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি করার নিষেধাজ্ঞা, হাদিস নং : ৫০৬৯ (ই.ফা. ৫০০৬)।

১১. জ্ঞানের বিষয় নিয়ে পুরুষ ও মহিলা সাহাবিদের মধ্যে বিতর্কে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে। হযরত উম্মে ফযল বিনতে হারেস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত, "আরাফাত দিবসে একদল লোক তাদের সামনে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রোযা রাখার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলো। তাদের কেউ কেউ বললো, তিনি রোযা রেখেছেন। আবার কেউ কেউ বললো, তিনি আজ রোযা রাখেননি। উম্মুল ফযল বলেন, আমি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালে তিনি তা পান করেন। তিনি তখন উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন"।[১]

১২. প্রসিদ্ধ সাহাবিদের মাধ্যমে প্রশ্ন করেও মহিলা সাহাবিগণ বিভিন্ন বিষয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে জেনে নিতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাস্‌উদ (রাদ্বি.)-এর স্ত্রী হযরত যয়নাব (রাদ্বি.)-এর হাদিসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যাতে তিনি হযরত বেলাল (রাদ্বি.)-এর মাধ্যমে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে প্রশ্ন করেন এবং নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উত্তর দিয়েছেন।

মুসলিম নর-নারী দ্বীন-দুনিয়ার জন্য যতটুকু জ্ঞান না থাকলে চলে না ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। এ প্রসঙ্গে গবেষকগণের মত হলো– দ্বীনের জন্য তার নিম্নে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে শরিয়তের জ্ঞান থাকতে হবে–

১. যতটুকু জ্ঞান থাকলে শির্‌ক-কুসংস্কার মুক্ত সঠিক আক্বিদা-বিশ্বাস ধারণ করা যায়।
২. যতটুকু জ্ঞান থাকলে শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে বাহ্যত নির্ভুলভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করা যায়।

---

১. সহিহ্ বুখারি, অধ্যায় : সাওম, পরিচ্ছেদ : আরাফার দিবসের সাওম, হাদিস নং : ১৯৮৮; সুনানে আবি দাউদ; সহিহ্ মুসলিম।

৩. যতটুকু জ্ঞান দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ, অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা যায়। তা এভাবে যে– ভালো গুণগুলো জানবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গঠন করবে। আর খারাপ দোষগুলো জানবে, আর তা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।

৪. যতটুকু জ্ঞান থাকলে একজন মানুষ পরিবার, সমাজ এবং সর্বোপরি নিজের সাথে সঠিক আচরণ করতে পারে। পাশাপাশি সে জানতে পারে কোনটি হারাম, কোনটি হালাল, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি ওয়াজিব নয় এবং কোনটি উচিত এবং কোনটি উচিত নয়।[১]

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ বলেন, "নারীর উপর অর্পিত দায়িত্ব সে যাতে যথাযথভাবে পালন করতে পারে তাই তাকে সুশিক্ষা দিতে হবে। কারণ শরিয়তের একটি নীতি হলো– কোন ওয়াজিব সম্পন্ন করতে যা প্রয়োজন, তাও ওয়াজিব"।[১] এছাড়াও প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কিছু শেখাও জরুরী হয়ে পড়ে। আবার কোন কিছুর জ্ঞান না থাকলে তা সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। তাই মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, "অতঃপর তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান"।[২]

আধুনিক যুগে নারী-শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা করা যায়

১. নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথম বিষয়টি হলো, নারী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় এবং বিয়ের পর তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

---

১. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, রাসুলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষাদান পদ্ধতি, বা. ই. সে. ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৩০-১৩১।

২. আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, রসূলের (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা, অনুবাদ : মওলানা আবদুল মুনায়েম, অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী, মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন, বি.আই.আই.টি., ঢাকা, ২০১১, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা। যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো যায়।[১]

২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের পেশাগত কাজে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহ্‌র নবির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে মহিলারা কুটির শিল্পের কাজ করত। সাহল (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক মহিলা একখানা 'বুরদা' নিয়ে আসলো। সাহল (রাদ্বি.) জিজ্ঞেস করলেন, 'বুরদা' কী আপনারা জানেন ? বলা হলো, হ্যাঁ! এক প্রান্তভাগে নক্‌শা করা বড় চাদর। সে (মহিলা) বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য নিজ হাতে এ চাদর বুনেছি। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাগ্রহে তার নিকট থেকে সেটি নিলেন। পরে তিনি তা পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন...."।[২] আর একজন মহিলা সাহাবি নার্সিং ও চিকিৎসার কাজ করতেন। হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় সা'দ আহত হলে....নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকেই যাতে তার সেবা-যত্ন করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তার জন্য মসজিদে তাঁবু খাটিয়ে দিলেন...."। হাফেজ ইবন হাজার বলেছেন, ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁবুটি রুফাইদা আসলামিয়ার (রাদ্বি.) উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা করতেন। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন তাকে (সা'দ রাদ্বি.) রুফাইদা (রাদ্বি.)-এর তাঁবুতে রাখো যাতে আমি নিকটে অবস্থান করে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি।[৩]

---

১. আল কোরআন, সূরা নাহল : ৪৩।

২. আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ, রসূলের (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা, অনুবাদ : মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২য় খণ্ড, বি.আই.আই.টি., ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৭৮।

৩. আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১, ৩৭২।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলা সাহাবীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি পশু চারণ, কুটির শিল্পের কাজ, সশস্ত্র বাহিনীর সেবা, রোগীদের ঝাড়ফুঁক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নার্সিংসহ অনেক কাজে পর্দাসহকারে অংশ নিতেন।

৩. মহিলাদের জন্য জুমা ও ঈদের নামাযের খুত্‌বায় আলোচিত বিশেষ নসীহতমূলক আলোচনার ধারণকৃত অংশ শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. মহিলাদের জন্য আলাদা শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ সহশিক্ষার পরিবর্তে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। আর যদি সর্বক্ষেত্রে এরূপ করা সম্ভব না হয়, তবে শরিয়ত সম্মত পর্দা সহকারে মহিলাদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদেরকে তাদের পর্দা রক্ষায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করা।

৫. বিখ্যাত মুসলিম স্কলারদের বক্তব্য-ওয়াজ-মাহফিলে এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক সভা-সেমিনারে মহিলাদের জন্য পর্দাসহকারে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে গবেষকগণ উল্লেখ করেন– "নারীদের প্রখ্যাত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনে বাধা দেয়া উচিৎ নয়। কিংবা পুরুষদেরকেও প্রখ্যাত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ কোন মহিলা শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনে বাধা দেয়া উচিৎ হবে না"।[১]

৬. নিজ গৃহে সাধ্যের মধ্যে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বই পাঠে মহিলাদের উৎসাহ দিতে হবে।

৭. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে জ্ঞান চর্চা করা যায়। অবসর সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তারা পরস্পর আলোচনার মাধ্যমেও জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এছাড়াও মাহরাম পুরুষের সাথে মহিলারা জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে পারে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৮. সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নারীদের ধর্মীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ, নার্সিং-এর মত বিশেষ পেশার জন্য, ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সেবা প্রদানের জন্য, শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান, ইয়াতিমদের তত্ত্বাবধান, শিশু সংশোধন কেন্দ্র, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য– ইত্যাদি পেশায় প্রশিক্ষিত মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজন। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে নারীর কর্মক্ষেত্র ও ইসলাম শীর্ষক অধ্যায়ের অষ্টম দিক নির্দেশনায় আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার

পরিবর্তনশীল বিশ্বে নারীরা আজ তাদের কর্ম-দক্ষতার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পুরুষদের সাথে সমভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণাসহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাদের এই উন্নতি-অগ্রগতিকে বাধা প্রদান বা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামও নারীদের উন্নতি-অগ্রগতিকে স্বাগত জানায়। কারণ নারীরা যদি অবহেলিত থেকে যায় তবে সমাজের প্রায় অর্ধাংশই অবহেলিত থেকে যায়। তাই ইসলাম নারীদের ব্যাপারে বিশেষ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে সর্বক্ষেত্রে। বিশেষত, কর্মক্ষেত্র, ওয়ারিস হিসেবে সম্পত্তি লাভ ও যথাযথ শিক্ষা অর্জনের বিষয়ে আমরা উপরে আলোচনা উপস্থাপন করেছি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই তিনটি বিষয়েই মূলত নারী সমাজ অবহেলার শিকার।

নিজেদের স্বার্থের জন্য বা অবহেলা করে সমাজের প্রায় অর্ধাংশকে অবহেলিত রাখার সুযোগ নেই। এর দ্বারা দেশ জাতি বিরাট ক্ষতির সম্মুখিন হবে। কারণ নারীর কর্মশক্তিকে অকেজো করে রাখলে রাষ্ট্রের উন্নয়নের গতিও শ্লথ হবে। আজ বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্পের সর্ববৃহৎ অংশ দখল করে আছে গার্মেন্টস শিল্প। আর এই শিল্প টিকে আছে অনেকাংশে নারী শ্রমিকের উপর। আর এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। আবার করোনাকালে যখন দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়, হাজার হাজার রোগীর চাপে সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলো যখন হিমসিম খাচ্ছিল তখন চিকিৎসা সেবায় বিরাট অবদান রাখেন নারী চিকিৎসক ও নার্সগণ। এতে তাঁদের অনেকেই ভয়ানক মহামারী কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণও করেন। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামেও দেশের নারী সমাজ অংশগ্রহণ করে এই দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রেখেছেন।

আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নারীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে এবং পাশাপাশি নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতিও দায়িত্ব পালন করবে। আর এই ব্যাপারে রাষ্ট্র-সমাজ তাকে সার্বিক সহযোগিতা করবে। আত্মীয়-পরিজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে সে তার জন্য নির্ধারিত অংশের মালিক হবে। এতে কেউ তাকে কোন অজুহাতে বঞ্চিত করতে পারবে না। আর শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার রয়েছে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সমাজ নারীদের জন্য যথাযথ নিরাপদ শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করবে। এটাই হলো ইসলামের শিক্ষা।

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN 978-984-8083-41-3